

হেমেন গুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স  ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

* * * * * * * * কলিকাতা-১২ * * * * * * * *



প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৭
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পন—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

৪২-এর শহীদদের উদ্দেশে

ভূমিকা

ঔপন্যাসিক আমি নই—সুতরাং '৪২' উপন্যাসে হয়তো বহু ত্রুটি রয়ে গেছে। পাঠক-পাঠিকার কাছে শুরুতেই তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ঔপন্যাসিক না হয়েও উপন্যাস-রচনায় আমাকে কেন প্রবৃত্ত হতে হল, তার কৈফিয়ৎ দেবার জন্য এই ভূমিকার অবতারণা।

পৃথিবীর সব দেশে লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে ছায়াচিত্রের প্রয়োজনীয়তা আজকাল স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, ছায়াচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার এত দ্রুতগতিতে হয়, যা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। তাঁরা একথাও স্বীকার করেন, লোকশিক্ষার সরল উপায় জাতির ও দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সেই ঐতিহ্য বজায় রাখবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতনা করা।

দু'শ বছরের পরাধীনতার অবসানের জন্য মুক্তিপিপাসু সর্বত্যাগী মহাপুরুষরা বারম্বার যে চেষ্টা করে গেছেন, সেগুলি নিঃসংশয়ে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য। স্বাধীনতার শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম '৪২'-এর ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে, আমি '৪২' নামে একটী ছায়াচিত্র প্রস্তুত করি।

প্রগতিপন্থী বাংলা ও ইংরেজী বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সহানুভূতিশীল ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনের ফলে একথা আপনাদের নিশ্চয়ই অবিদিত নেই যে '৪২' চিত্রটীকে পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম সেন্সর-বোর্ড সর্বসাধারণের নিকট পরিদর্শনের উপযুক্ত মনে করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এক প্রেসনোটে বোর্ডের এই অভিমত সমর্থন করেছেন। বোর্ডের মতে, এই ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হলে অস্থিরতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করবে এবং এই ছবি কয়েক স্থানে অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোর্ডের নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে

যা বলেছেন, সংবাদপত্রের মারফত সে কথাও নিশ্চয় সকলে জানেন। বোর্ডের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অভিমতের প্রতিবাদে তাঁদের প্রত্যেক উক্তির ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে আমি একটী বিবৃতি প্রকাশ করি। 'দৈনিক বসুমতী' ও 'সত্যযুগ, পত্রিকায় ঐ বিবৃতি ছাপা হয়। পাঠকপাঠিকাকে আমার সেই বিবৃতি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই। সেন্সর-বোর্ড বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিষেধাজ্ঞায় বিস্মিত হলেও আমি নিরুৎসাহ হই নি। '৪২, ছবি আমি আপনাদের দেখাতে পারলাম না, সেন্সর-বোর্ডের নিষেধাজ্ঞা এবং সরকারের তরফ থেকে ঐ নিষেধাজ্ঞার সমর্থনের জন্য। '৪২' এর কাহিনী উপন্যাস আকারে আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করছি এই জন্য যে, এর থেকে আপনারা কতকটা বিচার করতে পারবেন—জাতীয় সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে চিত্রে রূপায়িত করলে সেই চিত্র অস্থিরতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে কি না। '৪২' এর কাহিনীর আর যাই হোক,—অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হওয়া সম্ভব কি না—তা-ও আপনারা প্রণিধান করতে পারবেন।

বন্ধুবর শ্রীমনোজ বসুর উৎসাহে এবং পরিশ্রমে '৪২,-এর উপন্যাসরূপ এত শীঘ্র আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারলাম। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

বেঙ্গল পাবলিশার্স বইখানি প্রকাশের ভার নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

উদ্ধৃত সঙ্গীতাংশগুলির রচয়িতা বন্ধুবর শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ। তাঁর রচনা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে তিনি আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। **জয় হিন্দ্**

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬
১৩ বি বসপাস রোড
কলিকাতা—২৯

হেমেন গুপ্ত

১

১৯৪২ সাল। সিঙ্গাপুরে—মালয়ে—বর্মায়—জাপানী সৈন্যদল এগিয়ে আসছে দুর্বার গতিতে বন্যার জলস্রোতের মতো। বঙ্গোপসাগরের জলে হানা দিচ্ছে জাপানি সাবমেরিন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছে···দিল্লীর লাল-কিল্লায় স্বাধীন-ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়াবার দুর্নিবার আগ্রহে তারা বাধাবিপত্তি চুরমার করে এগিয়ে আসছে।

বিপদ দিন দিন যত ঘনীভূত হয়ে আসছে, ভারতের কোটি কোটি নরনারীর উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার তত কঠোর হয়ে উঠছে। নতুন নতুন এরোড্রাম তৈরী করার অজুহাতে হাজার হাজার গ্রামবাসীকে সাত পুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে চব্বিশ ঘণ্টায় নোটিশে চলে যাবার হুকুম দেওয়া হচ্ছে। জাপানীরা সমুদ্রপথে এসে পাছে যানবাহনগুলি অধিকার করে নেয়, তাই বাংলা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের সমুদ্রতীরবর্তী জায়গাগুলিতে বঞ্চনা-নীতি চালু করা হয়েছে—মোটর-বাস, সাইকেল, গরুর গাড়ী এমন কি জেলেদের নৌকাগুলি পর্যন্ত সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। নানা জাতীয় মিলিটারীর ছাউনি বসেছে গ্রামে। এই মিলিটারী ছাউনিগুলোর আশেপাশে যাদের বাস করতে হচ্ছে, তাদের অবস্থা হয়েছে আরো শোচনীয়। ক্ষেতে শস্য ফলাবার উপায় নেই, সেপাইরা কেটে নিয়ে যাবে। হাটবাজার বসাবার উপায় নেই, সেপাইরা এসে খুশিমতো দাম দিয়ে বা একেবারেই না দিয়ে জিনিষপত্তর সব কেড়ে নেবে। গ্রামের পথে ঘাটে মেয়েদের অবাধ চলাফেরার সুবিধেটুকু পর্যন্ত

নেই। কখন সেপাইরা কি করে এই ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত। উদ্বাস্তু, জীবিকাহীন, আতংকগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ নরনারীর চোখে আকুল আগ্রহ, কণ্ঠে নীরব জিজ্ঞাসা—কবে হবে এই অত্যাচারের শেষ? কবে আসবে পরাধীনতার নিষ্ঠুর গ্লানি থেকে মুক্তি?…

২

১৯৪২ সাল। এলো মহাত্মাজীর মহাবাণী! তিনি বললেন—ভারত ছাড়ো ইংরেজ। জাপানী অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য ভারতকে তোমাদের সমপর্যায় ভুক্ত করে নাও। স্বাধীন দেশের নরনারী মাতৃভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যে পরিমাণে আত্মদান করতে প্রস্তুত হবে, মাহিনার চাকর হিসাবে তাদের কাছ থেকে তার সামান্য অংশও পাওয়া যাবে না। ভারত ছেড়ে দাও—আত্মমর্যাদায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে দাও। বিশ্বের দরবারে সত্যিকার গণতন্ত্র-গঠনে সহায়তা করে নিজেদের আসন সুদৃঢ় করো।

অত্যাচারিত উৎপীড়িত, কোটি কোটি ভারতবাসী উৎকণ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো মহাত্মার আবেদনে। তাদেরই প্রাণের সত্য, সুস্পষ্ট আকাংখা জাতির জনকের মুখ দিয়ে ভাষারূপে প্রকাশ পেল। অস্থির, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো জনসমুদ্র।

আর ইংরেজ—কালা আদমীর এই ধৃষ্টতায় তারা আরও কঠোর হল। নিষ্পেষণের চাকা দ্রুততর চলতে সুরু হোলো। দেশের যেখানে যেখানে কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটি, সেই সব জায়গায় দলে দলে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানী হতে আরম্ভ হল।

৩

আগষ্ট, ১৯৪২।

সমুদ্রতীরের কাছাকাছি ছোট একটা গ্রাম। গ্রামের জমিদার-বাড়ী মিলিটারী থেকে দখল করে সেপাইদের আস্তানা করেছে। ত্রিরিশ সালের লবণ আন্দোলনের সময় এখানে বহু লোক দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল, কংগ্রেসের আধিপত্য এই ছোট্ট গ্রামেও অনেকখানি—তাই এখানেও এলো ট্রাক-বোঝাই করে দেশী বিদেশী রকমারী নতুন নতুন সৈন্যদল। গ্রামের লোক হয়ে উঠলো সন্ত্রস্ত। মেয়েরা আব্রু বাঁচাবার জন্যে ঘরের কোণে ঠাঁই নিলো।

৪

অজয় এই গ্রামেরই ছেলে। জন্মের পরই মা মারা গিয়েছিলেন তাকে শাশুড়ীর হাতে সঁপে দিয়ে। তিরিশের আন্দোলনে বাপ গিয়েছেন পুলিশের গুলিতে। বুকের রক্ত দিয়ে তাকে মানুষ করে তুলেছেন বুড়ী ঠাকুরমা। নিজের হাতে-গড়া সংসার বার বার ভেঙে গেছে—বারবার বুড়ী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের মৃতদেহ নিজের হাতে চিতায় শুইয়ে দিয়ে বালক অজয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছেন, "ছিঃ দাদা, কাঁদতে নেই। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া গৌরবের জিনিষ। তার জন্য কি শোক করতে আছে ?"

ছোট্ট আমি গ্রামের এই স্বল্পশিক্ষিতা মহিলার চরিত্রের দৃঢ়তায় আশেপাশের অনেকগুলি গাঁয়ের লোক তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, মা—বলে ডাকে।

কিন্তু এই বৃদ্ধাও সেদিন বিচলিত হয়ে উঠলেন, যেদিন স্কুলের পড়া শেষ করে অজয়ের সহরে গিয়ে কলেজে পড়ার সময় এলো। কিছুদিন আগে তাঁর একমাত্র কন্যাও তাঁর হাতে ছোট শিবানীকে সঁপে দিয়ে চিরবিদায় নিয়েছিল। অজয় আর শিবানীর মুখ চেয়ে তিনি সমস্ত ব্যথা সহজভাবে সহ্য করেছেন। কিন্তু এবার বুঝি আর তিনি পারেন না—তাই প্রায় জোর করেই তিনি অজয়ের বিয়ে দিলেন। হেসে বল্লেন, "ছুটীটুটী হলে ন'মাসে ছ'মাসেও একবার গাঁয়ে আসবে। বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন কি আর আমাকে দেখবার জন্যে ওর মন খারাপ হবে ? পিছটান রেখে দিলাম—এবার নিজের তাড়ায় ছুটোছুটি করবে।"

এরপর বছর তিনেক কেটে গেছে। সংসারে নতুন এক অতিথি এসেছে বছর দু'য়েক হোল। নাত বৌ বীণার হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে বুড়ী নিশ্চিন্ত মনে

চরকায় সুতো কাটেন, গ্রামের কংগ্রেসের কাজে সকলকে উৎসাহ দেন, আর শিবানী আর টুটুর আবদার—অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেন।

* * *

নতুন মিলিটারীর আমদানীতে ঠাকুরমাও শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। কাগজে দেখেছিলেন, এ. আই. সি. সি.-র আসন্ন মিটিংএ গান্ধিজীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের আলোচনা হবে। মনে মনে তিনি বুঝেছিলেন, সহজে ইংরেজ ভারত ছাড়বে না, আর তাহলেই সুরু হবে আন্দোলন। তা যদি হয়, তাহলে অজয়? একমাত্র ওই নাতিকে নিয়েই তাঁর সমস্ত আশা-ভরসা, সমস্ত রঙীন কল্পনা। অজয়কে কি তিনি বাধা দেবেন আন্দোলনে যোগ দিতে?···না, না, তা তিনি—পারবেন না। ছেলেবেলা থেকে তাকে শিখিয়েছেন দেশকে ভালোবাসতে, তার সামনে তুলে ধরেছেন তার স্বর্গগত পিতার আদর্শ। যদি সংগ্রাম বাধে তাহলে?

এমনি যখন ঠাকুরমার মনের অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন সকালের গাড়ীতে অজয় আর গাঁয়ের সব ছেলে সহর থেকে ফিরে এলো গান্ধিজীর মন্ত্র মুখে নিয়ে ···"ইংরেজ ভারত ছাড়ো···"

ঠাকুরমা তখন দাওয়ায় বসে চরকায় সুতো কাটছেন, বীণা তাঁর পাশে বসে কুলোয় করে চাল বাচছে আর শিবানী টুটুন উঠোনে হাঁড়িকুঁড়ি কাদা মাটী নিয়ে বসে ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত।

কাঁধে সুটকেস, হাতে বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে অজয়কে এমনি সময় হঠাৎ বাড়া ঢুকতে দেখে সকলে আনন্দচকিত হয়ে উঠলো। টুটুন আসার আগে মামার কোলে ওঠা শিবানীরই একচেটিয়া ছিল। এই কোলে ওঠার ব্যাপারে তাই সে টুটুনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী নয়। মামাকে বাড়ী ঢুকতে দেখে সে আগেভাগেই ছুটে গেল কোলে ওঠার জন্য। অজয় কিন্তু ততক্ষণে টুটুনকে কোলে তুলে নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দিয়েছে।

"টুটুন—টুটুন বাবু—খেলা হচ্ছে—খাওয়া হচ্ছে···টুটুন বাবু—"

আনন্দোজ্জ্বল মুখে বীণা চেয়ে আছে ওদের দিকে।

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে অজয়—হঠাৎ এলি যে? ব্যাপার কি?" টুটুনকে একবার ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার দু-হাতে লুফে নিয়ে অজয় বললো, "ব্যাপার? ব্যাপার হচ্ছে—"

হঠাৎ শ্লোগান দেবার ভংগীতে চীৎকার করে উঠলো—"ব্রিটিশ—" তারপর ঠাকুরমা আর বীণার দিকে আঙুল নেড়ে বললো, "বল, বল, বল—নাঃ, তোমরা বলতে পারলে না। টুটুন বাবু, তুমি বলতো বাবা ইংরেজ—"

টুটুন ভাবলো, বাবার কোলে চড়ে এই চেঁচানোর খেলাটা নিশ্চয় খুব মজার। তাই সে একবার মা-ঠাকুরমার আর অজয়ের দিকে চেয়ে নিয়ে আধো আধো ভাষায় চেঁচিয়ে বল্‌লো "ইংরেজ—"

"লক্ষীছেলে, বল, ভারত"—

টুটুন বাপের বুকে একটা ঘুসি মেরে বললো, "বলত"—

"ছাড়ো"—

আরেকটা ঘুসির সংগে টুটুন বললো, "ছালো—"

উচ্চকিত হেসে উঠলো অজয়, বললো, "কেমন, হেরে গেলে তো—?

ঠাকুরমা হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোর বিদ্বান ছেলের কাছে না হয় হেরেই গেলাম ; এখন উঠে ঠাণ্ডা হয়ে বোস্‌ দিকি!

অজয় বল্‌লো, "দাঁড়াও, এখনো শিবানীকেই যে কোলে করা হয় নি—"

কোলে ওঠার ব্যাপারে দ্বিতীয় স্থান নিতে শিবানী মোটেই রাজী নয়। টুটুনের প্রতি মামার এই পক্ষপাতিত্বে শিবানী রাগ করে দাওয়ার ওদিকে মামার দিকে পিছন ফিরে বসেছে।

অজয় তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, ওঃ বাবা, ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রাগুনীরাণী যে রাগে একেবারে গরগর করছে।"

শিবানী মামার সংগে আড়ি করে দিয়েছে, কাজে কাজেই মুখ ঘুরিয়েই বসে রইলো। অজয় ওর পাশটীতে বসে পড়ে বললো, "বলতো, শিবুরাণী আমার এ পকেটে কি ?"

শিবানী জানে, সহর থেকে ফিরে এলেই মামার পকেট থেকে ম্যাজিকের মত কত রকম খেলনা বার হয়। তাই একবার ভাবলো ঝগড়াটা এখন মুলতুবী রেখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু মামার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলো, প্রথম কোলে না নেওয়ার অপরাধের জন্ত এতটুকু অনুতাপের চিহ্নও নেই। সজোরে মুখ ঘুরিয়ে সে জবাব দিলো, "জানি না।"

মুখ টিপে একটু হেসে অজয় বললো "বলতে পারলে কিন্তু তোমার !"

"চাই না।"

"চাও না ? বেশ, তাহলে যাই—ওবাড়ীর মিনুকে দিয়ে আসি—"

অজয় উঠে পড়লো।

শিবানী দেখলো, সত্যিসত্যিই পকেটের মজা এবার হাতছাড়া হয়ে যায়। রাগ অভিমান ভুলে মামার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পুতুলটা বার করে নিতে নিতে বললো "বারে—মিনুকে দেবে কেন ?···না-না-না, দাও—শীগ্‌গীর দাও।"

অজয় এবার শীবানীকে কোলে তুলে নিল। নিজের দাবী পুরোপুরি আদায় করে নিয়ে শিবানী এবার নালিশ সুরু করলো, "জানো মামু, কাল রাত্তিরে যখন সেপাইদের গাড়ী আসছিল তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। দিদিমা তবু আমাকে কোলে নেয় নি।"

শিবানীকে কোলে নিয়েই ঠাকুরমার কাছে আসতে আসতে কপট গাম্ভীর্যের

সংগে অজয় বললো, "বটে! এ কিন্তু ঠাকমা, তোমার ভারী অন্যায়। ও তোমার কোলে চড়তে একটু ভালবাসে। তা কি করবে ও—বরাবরকার অভ্যেস তো? তা ও'ও এমন কিছু এখনও বড় হয় নি—আর তুমিও এমন কিছু সাংঘাতিক বুড়ী হও নি যে ওকে একটু-আধটু কোলে নিতে পারো না।"

শিবানী সজোরে প্রতিবাদ জানাল, "বা রে, তাই বুঝি! আমি মিছিমিছি কোলে উঠ্‌তে চাই নাকি? ভয় পেয়েছিলাম তাই জন্যেই তো—"

ঠাকুরমা হেসে উঠে বললেন, "হয়েছে, হয়েছে—আর মামুর কাছে নালিশ করতে হবে না। ওকে একটু বসতে দে—"

শিবানী মামুর কোল থেকে নেমে পড়ে দৌড়ল পাশের বাড়ী—মিনুকে তার নতুন পুতুল দেখাতে হবে।

অজয় দাওয়ার একধারে বসে পড়লো। ঠাকুরমা প্রশ্ন কোরলেন, হ্যাঁরে, বললি না তুই হঠাৎ চলে এলি কেন?"

বীণা একমনে চাল বাচ্‌ছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে অজয় একটু দুষ্টু হেসে বল্‌লে, "ঐ যে, ঐ তোমার নাতবৌ।"

বীণা চাপাগলায় বলে উঠ্‌লো, "আঃ।"

ঠাকুরমা আবার হেসে ফেললেন। বললেন, "ওকে আবার জ্বালাস্‌ কেন?" অজয় গম্ভীর মুখে জবাব দিলো, "বাঃ রে—ও যে আমায় চিঠি লিখলো যে ওর মন কেমন কর্‌ছে—আমাকে ছেড়ে আর একদণ্ডও থাকতে পারছে না—"

বীণা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো। কী দুষ্টু লোক রে বাপু! চিঠির কথা আবার সবাইকে বলে নাকি? এখুনি ঠাকুরমা হয়তো বলবেন যে ওর জন্যে তাঁর নাতির পড়াশুনো হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি অজয়কে বাধা দিয়ে সে বলে উঠলো, "আমি কক্ষণো অমন কথা লিখি নি।"

ঠাকুরমা হেসে বললেন, "তা' লিখলেই বা কি ? স্বামী দূরে থাক্‌লে অমন সব স্ত্রীই কাছে পেতে চায়।"

অজয় এবার ঠাকুরমাকে জব্দ করার চেষ্টায় ছিল ; একটু এগিয়ে ঠাকুরমার কাছটিতে ঘেঁসে সে বললো, "তাই নাকি ঠাক্‌মা ?···আচ্ছা, হ্যাঁ ঠাক্‌মা, ঠাকুর্দা সহরে গেলে তুমি কি করতে ?"

আড়চোখে একবার বীণার দিকে চেয়ে ঠাকুরমা বললেন, "এই বীণা যা কর্‌ছে—চিঠি লিখতাম্—দিন গুণতাম—"

বীণা ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে উঠলো, "দিন গুণতে আমার বয়ে গেছে।"

ভালো মানুষটির মতো ঠাকুরমা বললেন, "ও তা হবে।"

কিন্তু বীণাকে এত সহজে ছেড়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে নয়। অন্যদিকে চেয়ে তিনি দেখলেন টুটুন এক বালতি জল নিয়ে বাছুরটাকে চান করাচ্ছে, নিজেও করছে। বলে উঠ্‌লেন "দেখ, দেখ, দস্যি ছেলে ছিষ্টি একাকার করলে—"

বীণা তাড়াতাড়ি উঠে টুটুনের গা মোছাতে মোছাতে বললে, "ছিঃ টুটুন—জল ঘাঁটছ, আবার যদি অসুখ হয়—"

বীণাকে অন্যমনস্ক দেখে ঠাকুরমা অজয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে অজয়, তোর কলেজ খুলেছে আজ বাইশ দিন, না ?"

অজয় উত্তর দেবার আগেই বীণা বলে উঠলো, "না, সাতাশ দিন।"

ঠাকুরমা হেসে উঠে বললেন, "বটে ?···তবে যে এখুনি বললি, দিন গুণ্‌তে তোর বয়ে গেছে ?"

অজয় ঠাকুরমার এই চালাকিতে সশব্দে হেসে উঠে বীণাকে বল্‌লেন, "কেমন জব্দ ?···ও বুড়ির সঙ্গে চালাকি ?"

ঠাকুরমা বললেন, "তা এখন বাজে কথা রাখ দিকিন···হঠাৎ কি করে এলি, এখনো তো বললি না ?"

ঠাকুরমার আরও কাছে সরে এসে অজয় বলল, "আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো মহাওস্তাদ বুড়ী ··খবর-টবরও অনেক রাখো—টপ করে এটাও একটা আঁচ করে ফেল দেখি···হঠাৎ কেন এলাম ?"

মৃদু হেসে ঠাকুরমা জবাব দিলেন, "সে আমি কেমন করে জানবো ?"

"আচ্ছা তুমি চিন্তা-টিন্তা করে গ্যাখোই না"—অজয় বল্‌ল।

ঠাকুরমা একটু ভেবে নিলেন, তারপর বললেন, "তা কাগজে পড়ছিলাম—মিলিটারীরা নাকি বড় বড় বাড়ি সব দখল করেছে—"

সশব্দে হেসে উঠল অজয়। "ও-হো-হো ঠাকুমা, দেশ স্বাধীন হলে আমি তোমার জন্য দেদার ক্যানভাস করবো তোমাকে যেন প্রাইম মিনিষ্টার করা হয় ···ওরে বাপ রে কি সাংঘাতিক বুড়ী তুমি !"

ঠাকুরমা হেসে উঠলেন, বললেন। "আচ্ছা তা না হয় করিস·· এখন যা হাত-মুখ ধুয়ে নে।"

অজয় উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঠাকুরমার কি মনে হ'ল, ওকে আবার ডাকলেন, "হাঁরে অজয়, আজ রাত্রেই তো বোম্বাইতে কংগ্রেসের শেষ-বৈঠক বস্‌বে—না ?"

অজয় উত্তর দিল, "হ্যাঁ"।

ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করলেন, "গান্ধীজির প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে ; কি বলিস ?"

অজয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো, "নিশ্চয়ই।"

ঠাকুরমার চোখে ভেসে উঠলো তিরিশ সালের কথা···অজয়ের বাবার কথা। শঙ্কিত হয়ে বললেন, "তারপর ?"···

াকুরমার এই ভাবান্তর অজয়ের নজরে এলো না, সে সমান উৎসাহে

বলে যেতে লাগলো, "তারপর আর কি ?···ধরপাকড়, লড়াই, দাঙ্গা—ব্যস্। জেলা-কংগ্রেস তো এই জন্যই আমাদের যার যার গাঁয়ে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে—প্রস্তুত হতে হবে বলে, এবার শেষ-সংগ্রাম দেখো ঠাকুমা···সাংঘাতিক হবে। বুঝতেই তো পারছ—গান্ধীজি নিজে বলেছেন—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—আর এ. আই. সি. সি.র তা সম্পূর্ণ মেনে নিতে হচ্ছে।"

অজয় চলে গেল। ঠাকুরমা ভাবতে লাগলেন, আগের যুদ্ধে গেছে ছেলে। এবার······?

সেই রাত্রি···৭ই আগষ্টের রাত্রি। ভারতবর্ষের কোটি কোটি ঘরে মা-ঠাকুরমার দল উৎকণ্ঠ হয়ে বসেছিলেন—কি নির্দেশ আসে, সংগ্রামের কি ধারা মহাত্মাজী প্রবর্তন করেন···এই হয়তো শেষ সংগ্রাম···কত ছেলে···কত স্বামী ··কত সংসার যাবে। কিন্তু তবু স্বাধীনতা চাই···করেংগে ইয়া মরেংগে।

বোম্বাইতে এ. আই. সি. সি. গান্ধিজীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ করে গান্ধিজীকেই সংগ্রামের সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত করলো। আর ইংরেজ সরকারের শাসনতন্ত্র হঠাৎ চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠলো। ভারত-সচিবের কাছ থেকে হুকুম এলো বড়লাটের কাছে ··সেখান থেকে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে···তাঁরা আবার অনুরোধ জানালেন সামরিক কর্মচারীদের কাছে···"নেতাদের কয়েদ করো। কংগ্রেস বেআইনী বলে ঘোষণা করো। বঞ্চনা নীতি আরো কঠোর করো। কংগ্রেস-কর্মীদের জেলে পোরো। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলো সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দাও···দমন করো···বাধা দাও ··কংগ্রেসী তরফ কিছু করার আগেই ওদের শেষ করে দাও।"

শাসনের চাকা অব্যাহত ঘুরে চললো।

*　　*　　*

এই আবর্তের ধাক্কা আলিনান গ্রামেও এসে লাগল। ভোর হতে না হতে গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখল, মিলিটারী মেজর ত্রিবেদীর হুকুমে এক দল সেপাই এসে স্থানীয় কংগ্রেসের অফিস খানা-তল্লাসীর অজুহাতে ভেঙে চুরে দিয়ে, সেক্রেটারী সুশীলবাবুকে ধরে নিয়ে গেল। সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলো তাঁর শেষ কথাগুলো, "আমার গ্রামবাসিগণ—এই সূচনা থেকে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আমি শুধু এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে স্বাধীনতার যে কোন সংগ্রামে আমাদের গ্রাম কোনদিন পেছনে থাকে নি—এবারও যেন পিছিয়ে না থাকে···গান্ধিজীর নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়।"

সমস্ত গ্রামখানির উপর আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। এখানে-ওখানে গ্রামবাসীদের জটলা শুরু হয়ে গেল। দাশু কামারের কামারশালায় গ্রাম-বৃদ্ধদের জোর আড্ডা বসে। সেদিন সকালেও অনেকে এসে জমায়েত হয়েছিল।

নিভে-যাওয়া কল্কেটায় একটা টান দিয়ে দাশু চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকল, 'ময়না, এক ছিলিম তামাক সেজে দে তো মা।"

তারপর হরি মোড়লের দিকে ফিরে বললো, "দিনে দিনে এসব কি হচ্ছে বলতো ভায়া? কদিন ধরে নতুন নতুন সেপাই আমদানী হচ্ছে, আজ ভোর হতে না হতেই আমাদের সুশীলবাবুকে ধরে নিয়ে গেলো··· ব্যাপারটা কি?"

কপালে একবার হাত চাপড়ে হরি মোড়ল বললো, "মরছিলাম দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে, এবার বন্দুকের গুতোয় মরবো···কথা একই।"

উপস্থিত সকল ঘাড় নেড়ে সায় দিল। সত্যিই তো···কথা সত্যি। ব্যাপার তো একই।

সকলেই বিমর্ষ হয়ে পড়ল···এ অত্যাচারের শেষ হবে কবে?···আপদে-বিপদে কংগ্রেসই যা হোক তাদের দিকে দেখতো। আজ থেকে তা-ও এরা বন্ধ করে দিলে।

বাইরে হঠাৎ সাইকেলের ঘণ্টার শব্দে সকলের চমক ভাঙল। দাশু বলে উঠলো, "আরে সাইকেলের ঘণ্টা না? কে রে?"

একজন বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, "বিনোদ।" দাশু বললে, 'বিনোদ? আমাদের বিনোদ? ডাক তো, ডাক তো ওকে।"

সকলের ডাকাডাকিতে বিনোদ সাইকেল থেকে নেমে ওদের কাছে এগিয়ে এলো।

"বলি হা বাপু"—দাশু রাগ করে বললো, "সেপাইয়ের গুতো খাবার জন্য তোমার পিঠ সুড়সুড় করছে বুঝি ?"

অবাক হয়ে বিনোদ পাল্টা প্রশ্ন করলো, "কেন দাশুখুড়ো ?"

দাশুর রাগ আরো বাড়তে থাকলো, "কেন দাশুখুড়ো !···কলেজে পড়ো আর এটা জানো না—এ গাঁ দিয়ে সাইকেল চড়ে যাচ্ছ···তাও আবার ঘণ্টা বাজিয়ে ? জানো না গবরমেণ্ট সাইকেল, নৌকা, গাড়ী সব কেড়ে নিচ্ছে ?"

বিনোদ জবাব দিলে, "জানি দাশুখুড়ো, কিন্তু একটা জরুরী খবর নিয়ে তাড়াতাড়ি সহর থেকে ফিরতে হচ্ছে কিনা, তাই—"

"তুমি আবার কি খবর নিয়ে এলে হে ?" উৎকণ্ঠীত হয়ে দাশু প্রশ্ন করল।

"আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই"—বিনোদ বলল,—"তুমি মোড়লদের সব খবর দাও···এক্ষুনি কংগ্রেস-অফিসে যেন সব আসে।"

কল্কেয় ফু দিতে দিতে দাশুর বিধবা মেয়ে ময়না ঘরে ঢুকলো। বললো, "কংগ্রেস-অফিস কি আর আছে ? আজ সকালে সেপাই এসে সব ভেঙ্গে তচনচ্ করে দিয়ে গেছে।"

একটু চিন্তা করে বিনোদ বললো, "ও, কাজ শুরু হয়ে গেছে ! তাহলে সকলে অজয়দের বাড়ীতে এসো, ময়নাদি তুমি মেয়েদের খবর দাও।"

অজয়দের বাড়ীতে মিটিং বসেছে। গ্রামবৃদ্ধরা—চক্রবর্তী মশাই. হরি মোড়ল, মণ্ডল মহাজন, দাশু কামার এবং আরো অনেকে—অজয়, বিনোদ, রসিদ প্রভৃতি ছেলের দল—ঠাকুরমা, ময়না এবং আরো মেয়েরা—সবাই জড় হয়েছে। অজয়

খবরের কাগজের পাতা খুলে গম্ভীর স্বরে পড়ে যাচ্ছে—আর সকলে স্থির হয়ে শুনছে।

অজয় পড়ছে, "রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস-সভায় মহাত্মাজীর "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়াছে। প্রত্যূষেই মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও কংগ্রেস কার্যকরী সভার অন্যান্য সকল সভ্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গভর্নমেণ্ট কর্তৃক কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সর্বত্র কংগ্রেস-অফিসে পুলিশ হানা দিয়াছে, ব্যাপক খানাতল্লাসীর পর সকল কংগ্রেস-কর্মীকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

চক্রবর্তী বলে উঠলেন, "ও—তাই বল, আমি ভাবছিলাম রাত পোয়াতে না পোয়াতে আমাদের সুশীলকে হঠাৎ ধরে নিয়ে গেল কেন?"

কাগজটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে অজয় বললে, "এখন আমাদের এখানে কি করা কর্তব্য, সে বিষয়ে আপনাদের একটা পরামর্শ দরকার।"

গ্রামের মহাজন মণ্ডল মশাই। কোন গোলমাল শুরু হলে তাঁরই ক্ষতি হয় সব চেয়ে বেশী। সকালবেলা কাজকর্ম ফেলে রেখে এখানে আসতে হয়েছে বলে তিনি এমনিতেই বিরক্ত। তার ওপর এই নতুন হিড়িকের কথা শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। বললেন "দেখ হে বাপু, ওসব পরামর্শ-টরামর্শ আমি বুঝি না। সোজা কথায় আমি শুধু এইটুকুই বুঝি, এসব অর্থহীন হুজুগে মেতে কাজকর্ম ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট করে কোন লাভ নেই। অনেক হয়েছে—এতখানি বয়সে অনেক আন্দোলন দেখেছি, করেওছি। কিচ্ছু লাভ নেই, কিচ্ছু লাভ নেই।"

মণ্ডলের কথায় সকলেই একটু আহত হয়ে চুপ করে রইল। কারো কাছ থেকে চট্ করে প্রতিবাদ আসতে না দেখে ছেলেদের মধ্য থেকে রসিদ

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "আপনাদের কি ঐ একই মত! এতবড় একটা বিরাট আন্দোলন হবে, ভারতবর্ষে যা আর কখনো হয় নি আর তাতে আমাদের অঞ্চল যা প্রত্যেক সংগ্রামে বরাবর খুব বড় অংশ গ্রহণ করে আসছে, এবার চুপ করে তামাসা দেখবে?"

খুশী হয়ে উঠল দাশু। "কথাটা কিন্তু ঠিক·· ঐ রসিদ বলেছে না···বড় খাঁটি কথা···কি বল হরি মোড়ল ··ঠিক বলেছে কিনা?"

"হ্যাঁ, এতো ঠিক কথাই" সায় দিল হরি মোড়ল, "তা ছাড়া আমি তো মনে করি—যে কংগ্রেস আমাদের এখানে সকলের জন্য সময়ে অসময়ে এত উপকার করে, সেই কংগ্রেসকে গবরমেণ্টের ইচ্ছে হল আর একটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল—এ হয় না·· এ কিছুতেই হয় না। আচ্ছা এ বিষয়ে মাঠান কি বলেন?"

মণ্ডল মহাজন দেখলেন বাতাস উল্টোদিকে বইছে। তবু ভাবলেন, ঠাকুরমা বোধ হয় এদের এই পাগলামিতে রাজী হবেন না। তাই একটু আশান্বিত হয়েই বললেন, "হ্যাঁ, মা'র ওপর তো কারো কোন কথা চলতে পারে না। বলুন মা, আপনিই বলুন।"

সকলে সমস্বরে একথা সমর্থন করল।

ঠাকুরমা একটু ভেবে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, "আমি তোমাদের সব কথা শুনলাম। আমার মনে হয়···অবিশ্যি তোমরাও ভেবে দেখো ঠিক কিনা···আমাদের চোখের সামনে দেশের সব বড় বড় নেতাদের ধরে নিয়ে যাবে বিনা অপরাধে···আর আমরা তার সামান্য একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করব না···এ হয় না।"

ঠাকুরমা আবার একটু ভেবে নিলেন, তারপর শুরু করলেন "ইংরেজ—"

ঘরের একটা কোণে টুটুন এতক্ষণ আপনমনে খেলা করছিল। "ইংরেজ" কথাটি কানে যেতেই সে বাপের শেখানো শ্লোগান আউড়ে উঠলো, "বালত ছালো।"

দু'বছরের ছেলের এই বীরদর্পে সকলে হো-হো করে হেসে উঠলো। মণ্ডল মশাই বললেন, "হবে না···অজয়ের ছেলে তো!"

ঠাকুরমা শিবানীকে ডেকে বললেন, "শিবানী, যা তো শয়তানটা খালি দুষ্টুমী করছে—ওকে ওর মা'র কাছে দিয়ে আয়।"

সকলে থামলে ঠাকুরমা বলতে লাগলেন, "ইংরেজ যদি ভেবে থাকে যে কংগ্রেস শুধু নেতাদের···তাঁদের আটকে রাখলেই কংগ্রেস খতম হয়ে গেল···তা হলে তারা খুব ভুল ভেবেছে।"

ঠাকুরমার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ দৃঢ় হয়ে উঠল। তিনি বলে চললেন, "ইংরেজকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কংগ্রেস সকলের। সুতরাং কংগ্রেসকে বেআইনী করতে হলে দেশের সকলের সঙ্গে···এই আমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ওদের করতে হবে।"

উচ্চকণ্ঠে সকলে ঠাকুরমার এই কথাগুলো সমর্থন করল। দাশু বলল, "তাহলে সাব্যস্ত কি হল···আমাদের তাহলে কি করতে হবে?"

মৃদু হেসে ঠাকুরমা বললেন, "কি করতে হবে, তা এত তাড়াতাড়ি ঠিক করা সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয়··কালকে আমরা হরতাল পালন করি আর বিকালে একটা সভা ডাকি। সেখানে গান্ধীজীর "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব ও তাঁর নির্দেশ পাঠ করা হবে।"

এবারেও সকলের উচ্ছ্বসিত সমর্থন পাওয়া গেল।

মণ্ডল মশাই কিন্তু তখনো ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালেন।

"আচ্ছা আমি এখানে ছোট্ট একটা কথা বলি। এখনকার রাজত্ব তো বুঝতেই পারছি মিলিটারীর হাতে। পুলিশ নয় যে শুধু লাঠির ওপর দিয়েই যাবে, সভা করতে গেলে এবার আসবে বন্দুক-বেয়নেট—তখন রুখবে কে?"

মেয়েদের মধ্য থেকে ময়না বললো "সে আপনি ভাববেন না মণ্ডলকাকা, আমরা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীই সে ভার নিলাম।"

মনের জ্বালা মনে চেপে রেখে মণ্ডলমশাই হেসে বললেন, "বা—বা—বা এই তো চাই, এই তো চাই—না হলে দেশের কাজ কি? তাহলে আমরা এবার সভা ভঙ্গ করি···এদিকে আবার কাজ-কর্ম্ম···তাহলে কাল সকাল থেকেই দোকান পাট বন্ধ তো?"

ঘর থেকে সকলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

৬

হরতালের দিন সকালবেলা। বাজারের সব দোকান বন্ধ, শাকসব্জীর বাজারেও একটা লোকও আসে নি। শুধু মণ্ডলমশাই বন্ধ দোকানের পিছনের দরজা খুলে রেখে বসে বসে হিসেব লিখছেন। এমন সময় রেশন জোগাড়ের উদ্দেশ্যে মিলিটারী লরী এসে দাঁড়ালো বাজারের মধ্যে।

সেপাইরা চারিদিক খুঁজে এসে লরীতে লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেবকে জানালো, "সাব্ দুকান বন্ধ হ্যায়···হুকুম দিজিয়ে, দোকান তোড় হুঁ্য।"

আরেক সেপাই ছুটে এসে খবর দিলে, "সাব এক বড়া দুকান খুলা হ্যায়··· লেকিন পিছেসে।"

গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব বল্লেন, "চলো।"

মণ্ডলমশাই কাজ শেষ করে উঠবেন ভাবছিলেন। হঠাৎ দেখলেন একগাদা সেপাই তার দোকানে এসে ঢুকলো। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মণ্ডলমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

লেফটেনাণ্ট জিজ্ঞেস করলেন, "দোকানের মালিক আপনি ?"

একবার ঢোক গিলে নিয়ে মণ্ডলমশাই জবাব দিলেন, "আজ্ঞে হ্যা, স্যার।"

"দোকান বন্ধ রেখেছেন কেন ?"

মণ্ডল তেমনিভাবে জবাব দিলেন, "ভয়ে স্যার ··ঐ ছোঁড়াগুলোর ভয়ে······"

গলার স্বরটা একটু বাড়িয়ে লেফটেনাণ্ট বললেন, "ভয়ে ?···কিন্তু রেশন আমাদের চাই যে······"

মণ্ডল পরিত্রাণের পথ পেলেন,···বোধ হয় কিছু উপরি রোজগারেরও। মনে মনে খুশী হয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললেন, "নিয়ে নিন্

স্তর···সব নিয়ে নিন···তবে স্যার আমার দিকটাও একটু দেখবেন, গ্রামে বাস করতে হবে তো !"

মণ্ডল মশাইয়ের ব্যবসায়ী-মাথায় নতুন একটা মতলব খেলে গেল। বললেন, "আপনি দয়া করে একটা কাজ করুন না স্তর···সেপাইদের দিয়ে আমার সামনের দরজাটা ভাঙিয়ে দিন···তারপর আপনার যত খুশী ঐ সামনে দিয়েই নিয়ে যান।"

বিনয়ে মণ্ডল মশাই একেবারে মাটিতে নুয়ে পড়লেন, "আর স্যার, বুঝতেই তো পারছের···ঐ দামের সঙ্গে একটু বাড়তি dearness allowanceও দয়া করে যোগ করে দেবেন।"

লেফটেনান্ট হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "I see. You seem to be a very clever man. আপনি একবার আসুন না···আমাদের মেজর সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করুন···অনেক সুবিধে হবে।"

মণ্ডল মশাই বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "রাজী···খুব রাজী···ঐ সুবিধেটুকুই তো চাই স্যার।"

একটু ইতস্তত করে আবার বললেন, "কিন্তু স্যার, এমনিতে যাওয়ার অসুবিধে হবে···পাঁচজনে দেখে ফেলবে। তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন না স্যার, আমাকে গ্রেপ্তার করিয়ে নিন স্যার।"

এত বড় শয়তানি বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে লেফটেনান্ট সাহেব পুলকিত হয়ে উঠলেন, হেসে বললেন। "Very nice···চালাক লোক বটে! সুবেদার, ইন্‌কো লে চলো।"

দোকান থেকে বেরোবার সময় মণ্ডল মশাই দু'পাশে সেপাইদের ইঙ্গিত করে বললেন- "একটু ধরকে লেও না বাবা।"

বাইরে তখন হুকুমমতো মণ্ডল মশাইর দোকান ভাঙা শুরু হয়ে গেছে।

চারদিকে অল্প অল্প করে ভীড় জমতে আরম্ভ করেছে। মিলিটারী ট্রাকে উঠে মণ্ডল মশাই সমবেত গাঁয়ের লোকদের উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, "ছ্যাখো ভাই, ছ্যাখো···আমার ওপর কি অত্যাচার হচ্ছে, তোমরা ছ্যাখো। কেউ একবার দয়া করে বৈকুণ্ঠের মাকে খবরটা পাঠিয়ে দিও। আজ আমার সত্যি সত্যি প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসছে, ইংরেজ···"ভারত ছাড়ো"—

ট্রাক চলে গেল, আর গাঁয়ের লোক ভাবতে লাগলো "আহা এমন দেশপ্রেম আর দেখা যায় না।"

* * *

মিলিটারী ব্যারাকে মণ্ডল মশাই সারাদিন কি করলেন তা কেউ জানল না। কিন্তু বিকেলবেলার সভায় গাঁয়ের সবাই মিলে দেশের জন্য এবারে প্রথম নির্য্যাতন ভোগ করছেন বলে তাঁকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করল।

গলায় মালা ঝুলিয়ে মণ্ডল মশাই ইনিয়ে বিনিয়ে তাঁর কষ্ট-স্বীকারের কল্পিত কাহিনী বিবৃত করতে লাগলেন, আর গাঁ শুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সবাই অবাক হয়ে তা শুনতে লাগলো।

একটু পরেই কিন্তু রসিদ স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে খবর দিল যে মিলিটারী আসছে। তাড়াতাড়ি যদি গান্ধিজীর শেষ-নির্দ্দেশ ও "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব পাঠ করা না হয় তাহলে সভার আসল কাজই হয়তো বাকী থেকে যাবে। মণ্ডলমশাই অজয়কে পাঠ করবার হুকুম দিয়ে বসে পড়তে বাধ্য হলেন।

এদিকে তখন ট্রাক বোঝাই করে মিলিটারী এসে পড়েছে। সভার প্রবেশ-পথে ময়নার নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী পথ আগলে ছিল। সেপাই দেখে তারা বসে পড়ে ভেতরে ঢোকার উপায় একেবারে বন্ধ করে দিল। মিলিটারী দলের নেতা ক্যাপ্টেন সিং এগিয়ে এসে বললেন, "পথ ছাড়ো। শীগগির সরে যাও।"

রুখে দাঁড়ালো ময়না। বল্লে, "না—গান্ধিজীর নির্দ্দেশ যতক্ষণ না পড়া শেষ হয়, ততক্ষণ তোমরা যেতে পাবে না।"

রাগে ফুলতে ফুলতে ক্যাপ্টেন বললেন, "I give you the last warning··· সরে যাও।"

দৃপ্তস্বরে ময়না জবাব দিলে, "না···হিঁচড়ে টেনে সরিয়ে পথ করে নিতে পার।"

ময়নার ঔদ্ধত্যে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলেন ক্যাপ্টেন। তারপর বললেন, "এতক্ষণ তোমাদের ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম।"

মুখ ঘুরিয়ে ময়না জবাব দিলে, "হুঃ, ভেবেছ কি? আমরা কি সহুরে ভদ্দর লোকের মেয়ে যে ছুঁয়ে দিলে ইজ্জত যাবে। অমন লোক-দেখানো ইজ্জত আমাদের নয়।"

ময়নাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়ে ক্যাপ্টেন সাহেব দলবল নিয়ে মেয়েদের গায়ের ওপর দিয়েই সভায় ঢুকতে শুরু করলেন। প্রবেশপথে গোলমাল বেধে গেল, জনতা কেউ কেউ পালাতে লাগল। কেউ কেউ মেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করে উঠলো, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো।"

অজয় তখন পড়ে চলেছে গান্ধিজীর নির্দেশের শেষাংশ—"সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া আপনারা অগ্রসর হউন। চরম দমননীতি, গুলিচালনা, বোমাবর্ষণ,, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—এই সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে। রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। মুক্তির জন্য কোন মূল্যই বেশী নহে। সাহস অবলম্বন করুন। ভগবান আমাদের সহায়।"

সভা তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে সেপাইরা ক্রমশ বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের মতলব বুঝতে পেরে দাশু কামার

বলে উঠলো, "অজয়, রসিদ, বিনোদ তোমরা পালাও—তোমাদের যেন ধরতে না পারে।"

কিন্তু গান্ধিজীর নির্দেশ পাঠ করা তখনো শেষ হয় নি। বিনোদ, রসিদ ও আর সব ছেলেরা অজয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্ত্তের জন্য একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে অজয় শেষ করলো, "এই সংগ্রামই কংগ্রেসের শেষ সংগ্রাম। হয় সাফল্য না হয় মৃত্যু। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

উদ্বেল জনসমুদ্র গান্ধিজীর নির্দ্দেশে সাড়া দিল "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে···"

অজয় একবার ঠাকুরমার দিকে তাকাল। নীরব ভাষায় তাঁর কাছ থেকে পেল উৎসাহ। তারপর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

৭

জমিদার-বাড়ীর বড় হলঘরটায় এ অঞ্চলের মিলিটারীর কর্ত্তা মেজর ত্রিবেদী আফিস সাজিয়ে বসেছেন। জাঁদরেল লোক। অধীনস্থ অন্যান্য অফিসাররা তাঁকে যমের মতো ভয় করে। কড়া শাসনের জন্য ইংরেজ প্রভুরা মেজরের ওপর ভারী সন্তুষ্ট।

সভা ভেঙে দেবার পর উৎফুল্ল চিত্তে ক্যাপ্টেন সিং ঘরে প্রবেশ করলেন। মেজর তাঁর টেবিলে কাজ করছিলেন, একবার মুখ তুলে আগন্তুককে দেখে নিয়ে আবার কাজ করতে শুরু করলেন। একটু পরে কাজ করতে করতেই বললেন, "Yes…"

ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, "মিটিং ভেঙ্গে দিয়েছি স্যার।"

খুশী হয়ে মেজর বললেন, "Good, পাণ্ডাগুলোকে গ্রেপ্তার করেছেন ?"

এবারে ক্যাপ্টেন সিং বিব্রত হয়ে পড়লেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, "অন্য কোন দিক দিয়ে যাবার রাস্তা ছিল না বলে আমরা সামনে দিয়েই ঢুকেছিলাম স্যার। কিন্তু পাণ্ডা ছোঁড়াগুলো ওরই ভেতর দিয়ে যে কেমন করে পালিয়ে—"

আস্তে আস্তে মাথা তুললেন মেজর। অগ্নিগর্ভ স্বরে বললেন, "What ?… Fools………How dare you come to me with such a silly explanation ?"

গলার আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে লাগলো, "সামনে দিয়েই ঢুকেছিলাম স্যার —কেন সমস্ত জায়গাটা ঘেরাও করতে কে আপনাদের বারণ করেছিল ? Who stopped you from doing that ?"

ক্যাপ্টেন আরো বেশী অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, "কতকগুলো মেয়ে-ভলান্টিয়ার বসে পড়ে রাস্তা আটকে রেখেছিল। তাই—"

মেজর ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, "তাই আপনারাও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে সব বসে পড়লেন ?"

এই শ্লেষে ক্যাপ্টেন অপমানিত বোধ করলেন। বললেন, "তাদের গ্রেপ্তার করে এনেছি স্যার।"

ব্যঙ্গের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে মেজর বললেন, "Thank you so very very much. ভয়ানক কাজ করেছেন···বেছে বেছে কয়েকটা মেয়ে তুলে এনেছেন।···কোথায় তারা ?"

ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, "ডি. এস. পি তাদের Statement নিচ্ছেন।"

নিজের কাজে অসামরিক কর্ম্মচারীদের হস্তক্ষেপ করা মেজর মোটেই পছন্দ করেন না। কিন্তু এ অঞ্চলের সমস্ত জানে শোনে এমন একটি সরকারী লোক কাছে না থাকলে কাজের অসুবিধা হবে এই ভেবেই মেজর সাহেব এই ডি. এস. পি-টিকে বরদাস্ত করছিলেন। তাঁর আসামীকে হঠাৎ এই ডি. এস. পি. জেরা করছেন শুনে মেজর ত্রিবেদীর মেজাজ আরও খাপ্পা হয়ে উঠলো। বললেন, "তিনি Statement নিচ্ছেন ? কেন ? পাঠিয়ে দিন এখানে।"

ক্যাপ্টেন সিং পাশের ঘর থেকে চট্‌পট্‌ ডি. এস. পি ও ময়নাকে এঘরে পৌছে দিলেন। ডি. এস. পি-র দিকে চেয়ে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বার করতে পারলেন ?"

ডি. এস. পি. ঘাড় নেড়ে বললেন, "নাঃ, Very hard nut to crack."

মেজরের শ্লেষ এবার ডি. এস. পি-র দিকে বর্ষিত হলো, "And nuts are for cracking."

আরক্ত মুখে ডি. এস. পি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেজর চেয়ার ছেড়ে ধীর গতিতে ময়নার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি নাম তোমার ?"

সোজা কথায় ময়না জবাব দিল, "শ্রীমতী ময়না দাসী।"

কণ্ঠস্বর একটু মোলায়েম করার চেষ্টা করে মেজর বললেন, "ঘর-সংসার ছেড়ে এই সব হুজুগে মেতেছ কেন ?"

একবার মেজর সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ময়না মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

মেজর উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করে বললেন, "কথার জবাব দিচ্ছ না যে ?"

ময়না ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল, "ওকথার জবাব হয় না।"

বলার ভঙ্গীতে মেজর একটু অবাক হলেন। তারপর আরো নরম গলায় বললেন, "দেখ শ্রীমতী ময়না দাসী, ওরকম মেজাজী সুরে কথা বললে এখানে সুবিধে হবে না। মেয়েমানুষ—তোমাদের কাজ হচ্ছে ঘর-গেরস্থালী দেখা, সন্তান প্রতিপালন করা। এসব কংগ্রেসী গোলমালের মধ্যে তোমরা ঢুকতে আসো কেন ? জানো না এর ফল কি হতে পারে ?"

ময়না বিরক্তির সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করলে, "আপনার নীতিকথা শোনবার জন্যই কি আমাকে ধরে এনেছেন ?"

মেজর হেসে ফেললেন, বললেন, "হুঁ। হুজুগে না মেতে সত্যি সত্যি যদি দেশের উপকার করতে চাও তাহলে নিজের সংসারের উপকার আগে করো—এই কথাটাই শুধু তোমাকে বলছিলাম।"

মেজরের কণ্ঠস্বর আরো মোলায়েম হয়ে এল।

"যাক্ গে, দেখ ময়না, তোমার কাছ থেকে আমি কিছু পেতে চাই···" একটু থেমে কথাটা শেষ করলেন মেজর—"কয়েকটা খবর।"

টেবিলের ওপর থেকে একটা file তুলে নিয়ে তার থেকে কয়েকটা নাম

মেজর দেখে নিলেন। তারপর বললেন, "অজয়, রসিদ, বিনোদ—এরা সব তোমাদের গাঁয়েরই ছেলে ?"

ময়না জবাব দিল "হ্যা"।

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মিটিঙের পর তারা গেল কোথায় বলতে পারো ?"

"না।"

"না জানতে পারো, কিন্তু আন্দাজ করতে পারো তো ?" মেজর প্রশ্ন করলেন।

দৃপ্তভঙ্গীতে ময়না জবাব দিল, "পারলেই বা বলব কেন ?"

মৃদুহাস্যে মেজরের মুখ ভরে গেল, ময়নার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "বলবে, সব বলবে···আমার কাছে সব রোগেরই ওষুধ আছে।"

ময়না আরো জোরের সঙ্গে উত্তর দিল, "কি, করবেন কি ? চাবুক মারবেন ? তার জন্য তৈরী হয়েই এসেছি।"

মেজরের দুটো চোখ শয়তানিতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

কিন্তু যার জন্যে তৈরী হয়ে আসো নি যদি সেই ওষুধ দিই ?"

এ চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে লোকটার শয়তানির মাত্রা কতদূর যেতে পারে ময়না তা বুঝতে পারল, ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, গলা দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল, "উঃ, মাগো !"

মেজর আর একদফা হেসে নিয়ে বললেন. "তা হলেই বুঝে দেখ,···খবর আমার চাই-ই।"

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগলো ময়নার। তারপর মেজরের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে, "আমি বলবো না।"

একটু অবাক হয়ে এক মুহূর্ত্ত ময়নার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মেজর, তারপর বললেন, "বলবে না ? হুঁ······"

পরমুহূর্ত্তে ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেন সিংকে ডেকে বললেন, "একে ও-ঘরে নিয়ে যান। দশ মিনিটের মধ্যে ও যদি আমার কথার জবাব দিতে রাজী না হয়, তাহলে······" আবার একটু চুপ করে থেকে কঠিন কণ্ঠে শেষ করলেন, "তাহলে ওকে সেপাইদের ব্যারাকে পাঠিয়ে দেবেন।"

স্তব্ধ হয়ে গেল ময়না। একবার সে ভাবল নিজের কথা। পরমুহূর্ত্তেই তার মনে হলো দেশের কথা···গান্ধিজীর শেষ নির্দ্দেশের কথা। ক্যাপ্টেন যখন তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তখনও তেমনি দৃপ্তভঙ্গিতে সে জবাব দিয়ে গেল, "তবুও আমার কাছ থেকে একটা কথাও পাবে না। যা খুশী তোমরা করতে পার···মরার পথ তো আটকাতে পারবে না।"

ময়নার গমন পথের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে মেজর ফিরে এসে চেয়ারে বসে পাইপ ধরালেন। ডি. এস. পি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার একটু এগিয়ে এসে বললেন, "মেজর, একটা কথা বলবে ?"

"নিশ্চয়ই বলুন—" মেজর জবাব দিলেন।

অল্প ইতস্তত করে ডি. এস. পি বললেন, "এটা কি একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?"

পাইপে একটা টান দিয়ে মেজর হেসে বললেন, "Really ? ··বসুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল।

৮

তিনদিন বাদে হঠাৎ দেখা গেল, দাশু কামার পাগলের মতো রুক্ষবেশে অজয়কে ডাকতে ডাকতে ওদের বাড়ী ঢুক্ছে। অজয় যে ওর নিজেরই পরামর্শে পালিয়ে গেছে—লুকিয়ে আছে, তা আজ দাশুর মনে নেই। ওকে অমনি ভাবে ঢুকতে দেখে ঠাকুরমা ত্রস্ত হয়ে উঠ্লেন। বীণা অজয় ও তার সহকর্মীদের জন্যে খাবার গুছিয়ে রাখছিল,—সন্ধ্যা হলে তাদের গোপন আড্ডায় পৌঁছে দেবে···সে-ও উঠে এলো।

ঠাকুরমা বলে উঠলেন, "কি হয়েছে দাশু?···অজয় তো আসে নি।···ময়নার কোন খবর পেলে?"

দাশু ধপ করে ঠাকুরমার পায়ের কাছটায় মাটিতেই বসে পড়ল, বলল, "মাঠান!······খবর?······ পেয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছি।"

দাশুর অবস্থা দেখে ঠাকুরমা শংকিত হয়ে উঠলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় সে?"

জবাব দিতে গিয়ে দাশুর ঠোঁঠ দুটো কাঁপতে লাগলো—অত বড় মানুষটার চোখ দিয়ে ঝর্-ঝর্ করে জল পড়তে লাগল, অবরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলো, "ঐ—ঐ—জমিদারের ঝিলে—

বীণা ভাবল বুঝি সত্যিসত্যিই দাশুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ব্যস্ত ভাবে সে বলল, "কি বলছ তুমি, দাশুকাকা?"

ঠাকুরমাও সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, "ময়না কি—"

ওঁদের প্রশ্নে বাধা দিয়ে দাশু বললে, "মরে নি—মেরেছে, ওরা মেরেছে! এই আমি সেখান থেকেই আসছি। তিনদিন বাদে আজ ভেসে উঠেছে। আমি দেখে এলাম—"

বীণা কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কি করে এমন হল?"

একবার বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে দাশু নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল। তারপর বল্‌তে শুরু কোর্‌লো, "ঐ মিটিংএর পর তো ওকে ধরে নিয়ে গেল···কথা বার করবার অনেক চেষ্টা করল! কিছুতেই যখন পারল না, তখন হাতে হাতকড়া দিয়ে সেপাইদের ঘরে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল—

আর বলতে পারল না দাশু—কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তারপর ঐ কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা কোরল, "মাঠান, ময়না তো কোন পাপ করে নি, তবে তার—"

এতবড় দুঃখের কথা বীণা আর দাঁড়িয়ে শুনতে পারল না—দু'চোখ জলে ভেসে গেল তার। আস্তে আস্তে সে ওখান থেকে সরে গেল। ঠাকুরমারও নিজেকে সামলে নিতে কিছুটা সময় গেল। তারপর দাশুর ক্রন্দনরত মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "পাপ করেছে বই কি দাশু—পরাধীন দেশে সব চেয়ে বড় যে পাপ তা সে করেছে, স্বাধীনতা চেয়েছে।"

দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে দাশুর লোহা-পেটা পেশীগুলো ফুলে উঠল; প্রতিহিংসায় তার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌লো—সে বল্‌লো, "কিন্তু আমি ছাড়ব না···এর শোধ আমি নেবো মাঠান···রক্তের বদলে রক্ত, পাপের বদলে পাপ।"

শান্তকণ্ঠে ঠাকুরমা বললেন, "ও কথা বলতে নেই দাশু। তুমি না গান্ধিজীর ভক্ত! হিংসার কথা তোমার মুখে মানায় না বাবা।"

জ্বলে উঠলো দাশু, "রাখো তোমার হিংসা আর অহিংসা। আমি ওসব বুঝি না। তোমার মেয়েকে মাঠান যদি তোমার চোখের সামনে বেইজ্জত করত·· ঐ রকম টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেত, তাহলেও কি তুমি অহিংসার বুলি কপচাতে?"

দাশুর উত্তেজনা ঠাকুরমা বুঝলেন। তাই এরকম কথা শুনেও তিনি বিচলিত

হলেন না। বরং আরও নরম গলায় বললেন, হ্যাঁ দাশু, তবু ঐ কথাই বলতাম—বিশ্বাস করো।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল দাশু। একটু পরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমায় মাপ কর মাঠান···রাগের মাথায় কি যা-তা সব বলে ফেললাম।"

ঠাকুরমা বললেন, "ছিঃ দাশু, কাঁদতে নেই। দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে তার জন্য কি কাঁদতে আছে ?"

দাশু বললে, "মাঠান, শুধু যদি প্রাণটাই ওরা নিতো, দুঃখ করতাম না··· কিন্তু আমার অমন পবিত্র মেয়েটার ধর্ম্ম কেড়ে নিল !"

স্নিগ্ধকণ্ঠে ঠাকুরমা উত্তর দিলেন, "ধর্ম্ম কি এত ঠুনকো জিনিষ দাশু, যে কোন পশু তা জোর করে কেড়ে নিতে পারে ? ধর্ম্ম হচ্ছেন ভগবান। তাঁর বাস দেহে নয় আত্মায়···দেহ অপবিত্র হলে আত্মা তো অপবিত্র হয় না। সুতরাং ধর্ম্মও অপবিত্র হয় না।"

একটু যেন মনে জোর পেল দাশু·· তাহলে হয়তো তার ময়না নিষ্পাপই আছে। সে বলল, কিন্তু মাঠান, ময়না তো দেশের একটি মাত্র মেয়ে নয়। আরো তো অনেক মেয়ে আছে। তারা কি নিজেদের রক্ষা করবার কোন চেষ্টাই করবে না ?"

ঠাকুরমা জবাব দিলেন, "নিশ্চয় করবে দাশু—"

অধীর হয়ে দাশু প্রশ্ন করলো, "কিন্তু কি করে ?"

"এর জবাব তো গান্ধিজীই দিয়েছেন···বুকে ছুরি বসিয়ে—"

দাশু যেন বিশ্বাস করতে পারল না কথাটা। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "বুকে ছুরি বসিয়ে ?"

ঠাকুরমা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তিনি বলেছেন প্রত্যেক মেয়েই নিজের ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য একখানা ছুরি রাখতে পারে।"

দাশুর বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন হতে লাগল। অশিক্ষিত কামার সে। ঠাকুরমার সব কথা হয়তো ঠিক বুঝল না। নিজের পছন্দমতো একটা মানে তৈরী ক'রে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বীণাকে ডাক দিয়ে বলল, "বৌমা, তুমি আজ অজয়ের কাছে তার খাবার নিয়ে যাবে? তাকে বলো, বুঝলে মা··· তাকে বলো যে আমার রাস্তা আমি খুঁজে পেয়েছি···সত্যিকারের দেশের কাজ। বলো তাকে—"

তারপর ঠাকুরমার দিকে ফিরে বলল, "মাঠান অমি এখন চলি।"

ব্যস্ত হয়ে দাশু চলে গেল। তার গমনপথের দিকে চেয়ে ঠাকুরমার দু'টি চোখ জলে ভরে এলো···দেশকে স্বাধীন করতে হলে না জানি এমনি কত ময়নার জীবন আহুতি দেবার প্রয়াজন হবে। আর অজয়, তাঁর চোখের মণি, তাঁর ভবিষ্যতের আশা···বাড়ী-ঘর ছেড়ে কোন মাঠের মধ্যে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে শেয়াল-কুকুরের মতো বাস করছে·· সময়ে খেতে পায় না, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পায় না! দেশ···দেশ···দেশ! কিন্তু দেশকে ভালবাসতে তিনিই তো শিখিয়েছেন। মহাত্মাজীর আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে তিনিই অজয়কে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ঘরের মধ্যে অসুস্থ টুটুন শুয়ে ছিল··হঠাৎ কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি ঢুকে ঠাকুরমা ওকে কোলে তুলে নিলেন। একদিন অজয়ের বাবাকে এমনিভাবেই কোলে নিয়ে ভবিষ্যৎকে কল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দেশের জন্যে হাসিমুখে তাঁকেও তিনি বিসর্জ্জন দিয়েছেন। অজয়কে নিয়েও সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন। এবার হয়তো তাকেও···

টুটুনকে বুকে চেপে গান্ধিজীর শেষ নির্দ্দেশ আর একবার মনে করলেন। ঠাকুরমা—"সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইয়া আপনারা অগ্রসর হউন···মুক্তির জন্য কোন মূল্যই বেশী নহে। সাহস অবলম্বন করুন। ভগবান আমাদের সহায়।"

৮

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গাঁয়ের রাস্তা এমনই অন্ধকার—মেঘ করেছে বলে আজ যেন আরো বেশী অন্ধকার লাগছে। রাস্তার মোড়ে ঘোড়ায় চড়ে এদিকে সেদিকে ঘুরে ঘুরে মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে।······

সারা দেহ বোরখায় ঢেকে অজয়দের খাবার হাতে নিয়ে বীণা চলেছে বনের মধ্য দিয়ে। বাজারের কাছে আসতেই হঠাৎ সে দেখল, কয়েকজন মিলিটারী অফিসার ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। বীণা তাড়াতাড়ি একটা দোকানের পাশে লুকিয়ে পড়ল। ওরা চলে যাবার পর আবার চলতে শুরু করবে, এমন সময় কে যেন চাপা গলায় পেছন থেকে ডাকলো—"বৌদি!"···

চমকে মুখ ফিরিয়ে বীণা দেখলো একটি মুসলমান ছেলে। ত্বরিত পায়ে ছেলেটি কাছে এগিয়ে এসে বললো, "বৌদি, আজ আপনি এদিক দিয়ে যাবেন না। এ রাস্তায় আজ সেপাইদের পাহারা খুব জোর।"

পাশে অন্ধকার থেকে আর একটি ছেলেকে ইঙ্গিত করে ডেকে বললো, "অনিল, তুমি বৌদির সঙ্গে যাও। দক্ষিণ পাড়া দিয়ে আড্ডায় পৌঁছে দাও।"

অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে সাপখোপের গাত কোন রকমে এড়িয়ে বীণা যখন অজয়দের মাটি তলার গর্ত্তে গিয়ে পৌছুলো, তখন রাত গভীর হয়েছে।

অজয়, রসিদ, বিনোদ ও অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা তখন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ময়নার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছিল। খাবারের বোঝা

নামিয়ে রেখে বীণাও একপাশে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। একটু পরে অজয় মাথা তুলে বললো, "ময়নাদির আত্মত্যাগের এই আদর্শ আমরা যেন চিরদিন চোখের সামনে সুস্পষ্ট রাখতে পারি।"

যুক্তকরে সকলে স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো।

অজয় এবার বললো, "আপনারা যাঁরা দূর থেকে এসেছেন, তাঁরা এবার যান। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

নীরবে নত মস্তকে মেয়েরা এবং যে সব ছেলেরা মিলিটারীর সুনজরে পড়ে নি তারা বেরিয়ে গেল। বীণার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে অজয় বললো, "আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আর আসতে পারবে না। যে কড়া পাহারা বসিয়েছে!"

বীণা অল্প হেসে জবাব দিলে, "তোমাদের পাহারাও তো কম নয়! খাবার এনেছি।"

খাবারের কথায় ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠলো। বিনোদ এগিয়ে এসে বললে, "বাঁচালেন বৌদি, বলতেও পারছিলাম না, সহ্য করতেও পারছিলাম না। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

বীণা বললে, "আহা তা লাগবে না? সেই কাল সন্ধ্যায় তো খেতে পেয়েছো! এসো ভাই, এসো—সব বসে পড়।"

জোয়ান ছেলে সব—চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর সামান্য দুটো খেতে পেয়ে ওদের পেট ভরে না···কিন্তু খাবার পাবার এই একটিমাত্র উপায়। শালপাতায়, হাতে—যে যেমনভাবে পারলো গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলো। সবশেষে অজয়ের হাতে খাবার তুলে দিয়ে বীণা বললো, শোনো, দাশুখুড়ো বিকেলে আমাদের এখানে এসেছিলেন।"

দাশুর কথায় সকলেই নির্ব্বাক হয়ে গেল। অজয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বীণার

মুখের দিকে তাকালো। বীণা বললো, "তোমাকে বলতে বললেন যে তিনি তাঁর দেশ-সেবার পথ খুঁজে পেয়েছেন।"

অজয় গম্ভীর গলায় বললো, "বেচারী!···ময়নাদির কথা সত্যি ভাবা যায় না।"

বীণা বললো, "আমি কিন্তু বলবো, মেরে ফেলে ওরা ময়নাদিকে মুক্তি দিয়েছে।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে অজয় প্রশ্ন করলো।

বীণা জবাব দিলে, "এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া মুস্কিল। ওর পর কোন স্ত্রীলোকের বেঁচে থাকা উচিত নয়।···থাকলে সংসারের অকল্যাণ হয়।"

মৃদু হেসে অজয় বললে, "এ তোমার বড্ড সেকেলে কথা বীণা। উনি তো আর স্বেচ্ছায় কিছু করেন নি।"

বীণা জোর দিয়ে বললে, "তবু··"

অজয় বুঝলো এই নিয়ে বীণার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ওর ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, কল্যাণ-অকল্যাণের সংজ্ঞা আলাদা। বীণা সত্যিই এসব বিষয়ে এখনো সেই সীতা-সাবিত্রী যুগের মানুষ। স্ত্রীলোকের সতীত্বের চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই তার কাছে। কথা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টায় অজয় বললে, "যাকগে, টুটুন কেমন আছে বীণা?"

বীণা বললে, আজ আর জ্বর আসেনি। তবে তোমার নাম করে বড্ড কাঁদছে।"

"ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?" অজয় জিজ্ঞেস করলে।

বীণা বললে, "হ্যাঁ, ওষুধ দিয়ে গেছেন।"

ছেলেদের খাওয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাসনপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে সামনে একটা নক্সা পড়ে আছে দেখে বীণা জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কি?"

অজয় জবাব দিলো, "ও একটা নক্সা।"

বীণা বললে, "তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু কিসের?"

উত্তর না পেয়ে অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, "ও-বলবে না বুঝি?"

অজয় ইতস্তত করছিল। পাশ থেকে রসিদ বলে উঠলো, "কেন বলবে না? আপনাকে বলতে আপত্তি কি? শুনুন বৌদি, জেলা থেকে খবর পেয়েছি কংগ্রেস লীগ্ গিরই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তখন তো আমাদের সব দখল করতে হবে। কাছারী, আদালত, পোস্টাপিস—এগুলো দখল করা কিছুই না। আসল সমস্যা হচ্ছে জমিদারের বাড়ী—ঐ যেখানে মিলিটারীর ঘাটি হয়েছে—ঐটে দখল করা। তাই প্ল্যান করছি কি করে সেটা সম্ভব হবে।"

আগ্রহভরে বীণা জিজ্ঞেস করলে, "কি প্ল্যান করছো?"

এবারে অজয় এগিয়ে এসে বললে, "এই দেখ, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই তো মিলিটারী ব্যারাক—এর চারদিক থেকে চারটে রাস্তা ধরে ভিন্ন ভিন্ন প্রশেসন আসবে। প্রথমটা চালনা করবো আমি। দ্বিতীয়টা চালনা করবার কথা ছিল ময়নাদির—এখন এইটে নিয়ে একটু মুস্কিল হয়েছে।"

বীণা বললে, "কেন, মুস্কিল হয়েছে কেন?"

একটু ভেবে মুখ তুলে অজয়ের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো, "ময়নাদির জায়গায় না হয় আমিই এলাম।"

ছেলের দল উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো। অজয় শুধু অবাক হয়ে বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘর, সংসার, টুটুন এসব ছাড়া বীণা অন্য কিছু জানে না, জানতে চায় না। মহাত্মা-জীর কণ্ঠ থেকে আজ একি আহ্বান ধ্বনিত হয়ে উঠলো যা বীণার মত মেয়েকেও ঘর ছেড়ে পথে টেনে বার করে আনছে।

ছেলেদের উল্লাস থামিয়ে দিয়ে বীণা বললো, "কিন্তু একটা কথা। আমি বাপু তোমাদের মত ওরকম চেঁচামেচি করতে করতে যেতে পারবো না—আমার দল গান গেয়ে গেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।"

প্রচণ্ড উৎসাহে ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠলো। সকলেই বীণার দলে ভর্ত্তি হবার জন্য আবেদন পেশ করতে লাগলো। যে গান গাওয়া হবে সেটা, এখন থেকেই শেখাবার জন্যে নিদেন পক্ষে একবার শুনিয়ে দেবার জন্যে তারা কোলাহল করে উঠলো। কানে হাত চাপা দিয়ে বীণা বলে উঠলো, "আচ্ছা শোনাচ্ছি, এমন গোলমাল শুরু করেছ যে এখুনি সেপাইরা তাড়া করে আসবে। চুপ কর, আমি গাইছি।"

একটু স্তব্ধ থেকে বীণা গাইতে শুরু করলো—

ওই কণ্টকময় বন্ধুর পথ বজ্রের সম্ভার—
সব যাত্রীর দল বিদ্যুৎবেগে ভেদ করো বুক তার।
ঐ নারী ও শিশুর আর্ত্তনাদ
অসহ নির্য্যাতন
দগ্ধ গৃহের স্তব্ধ প্রাণের
বীভৎস ক্রন্দন।
আজ প্রতিজ্ঞ হও, বন্ধ করিতে পাশব অত্যাচার।

ওই কঙ্কালদল স্থির নিশ্চল চক্ষে সর্পভয়!
হিংস্র সে কোন রক্ত শোষণ করিছে ওদের ক্ষয়,
ওই হত্যা-প্লাবন রুদ্ধ করিতে জাগো আজ দুর্ব্বার,
সংশয় আর নয়
মৃত্যুর পথে আনো হে যাত্রী
মৃত্যুর পরাজয়
সব রক্তশিরায় মহাকাল নিক্ ভয়াবহ রূপ তার।

৯

ক'দিন থেকে দাশুর কোন খবর নেই। লোকে বলে ময়নার মৃত্যুর পর থেকে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দাশুর দোকান গাঁয়ের মোড়লদের আড্ডাখানা ছিল—আজ কয়েকদিন ধরে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। দাশু বাড়ীতে থাকে কিনা তাও কেউ জানে না। রাতের বেলা কেউ কেউ দেখেছে, ময়নার শোকে পাগলের মত হয়ে বিড়-বিড় করে কী বক্তে বক্তে দাশু পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন দুপুরবেলা মণ্ডল মহাজন নানা রকম ভাব্তে ভাব্তে দাশুর বাড়ীর সামনে দিয়েই বাড়ী ফিরছিলেন। নতুন এক উপদ্রব দেখা দিয়েছে আশপাশের গাঁয়ে। সেপাইদের কারা ছোরা মারছে—কাল মেজর সাহেব বলেছেন, দোষী ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা রকম বখশিস্ মিল্বে। হঠাৎ হাতুড়ীর শব্দে চকিত হয়ে উঠলেন মণ্ডল মশাই—দোকান বন্ধ করে দাশু কি তৈরী করছে? চুপি চুপি এগিয়ে এলেন মণ্ডল মশাই, তারপর বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগলেন—দরদর করে ঘাম পড়ছে দাশুর, নেহাই-এর ওপর কী একটা রেখে সজোরে হাতুড়ী পিট্ছে সে, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন সারা মুখে—সত্যিই পাগলের মত দেখাচ্ছে তাকে।

মণ্ডলমশাই একটু সরে এসে ভাবতে লাগলেন—ঝাঁপ বন্ধ করে লুকিয়ে লুকিয়ে কার কাজ করছে সে? তবে কী ছোরা?

বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা মণ্ডল মশাইয়ের মাথায় খেলে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে একটু জোর গলায় ডাকলেন, "আরে, দাশু আছ না কি?"

হাতুড়ীর আওয়াজ থেমে গেল। একটু বাদে ভীতচকিত স্বরে প্রশ্ন এলো' "কে?"

মণ্ডলমশাই কণ্ঠস্বর মোলায়েম ক'রে জবাব দিলেন, "আমি মণ্ডল।"

একটু আশ্বস্তভাবে ভেতর থেকে দাশু বললো, "ও, মণ্ডল-ভাই··· দাঁড়াও, খুলছি।"

মণ্ডলমশাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলার শব্দ পেলেন, তারপর শুনলেন। হাপর টানে যে ছেলেটা তাঁকে দাশু বলছে, "কেষ্ট, খুলে দে তো রে।"

কেষ্ট ঝাঁপটা একটু তুলে ধরলো। মণ্ডলমশাই চারিদিক ভালো করে দেখতে দেখতে ঢুকে বললেন, "কপাট বন্ধ করে আবার কি ঠুকছো হে?"

দাশু এতক্ষণ যা' ঠুকছিল সমস্ত সরিয়ে ফেলেছে। পাশ থেকে গামছাটা তুলে নিয়ে ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লো, "ঠুকবার আর আছে কি ভাই, এই কপালটা ছাড়া?"

মণ্ডল বুঝলেন সোজা কথায় উত্তর পাওয়া যাবে না। দাশুর পাশে ছোট মোড়াটার ওপর বসতে বসতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার এখানে এলেই ময়নার কথা মনে পড়ে—আসতে না আসতে কি রকম তামাক সেজে হাজির করতো!"

মণ্ডলমশাই আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আড়চোখে একবার দাশুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সে তখন মাথাটা নীচু করে বসে আছে। মণ্ডলমশাই সহানুভূতির মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে বললেন, "তুমি দেখো দাশু, এত অত্যাচার ভগবান সইবেন না। এ পাপের শাস্তি ওদের পেতেই হবে।"

আর একবার তার দিকে চাইলেন মণ্ডলমশাই। এবারও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বললেন, "আরে, হবে বলছি কেন, হতে আরম্ভ করেছে। বাসদেবপুরে কাল এক হারামজাদা মরেছে, না?"

দাশু এখনো নিস্তব্ধ। মণ্ডলমশাই কিন্তু হাল ছাড়লেন না, বললেন, "এক ঘা, বুঝলে না?···ব্যস্‌, একেবারে বুকের এপিঠ-ওপিঠ!"

এতক্ষণে যেন দাশুর চমক ভাঙলো···আস্তে আস্তে মাথা তুলে সে মণ্ডলমশাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। তারপর যেন কিছু বুঝতে পারে নি এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করলো, "এপিঠ-ওপিঠ ?···কোথায় ? কিসে ?"

মণ্ডল আশান্বিত হয়ে উঠে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "ছোরা হে ছোরা—আমাদের দেশী ছোরা ! হ্যাঁ, কারিগর বটে। এক ঘায়েই কাবার !"

দাশু ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "সত্যি ? তুমি ঠিক বলছো ?··· এক ঘায়েই—"

মণ্ডল এবারে তাঁর সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। গলার স্বর একটু নামিয়ে উৎসাহ দেবার ভংগীতে বললেন, "তা নয় তো কি ? আমি—আমি দেখে এলাম যে ! তোমার যদি মন-মেজাজ ভালো থাকতো, তাহলে তোমাকেও বলতাম দাশু, বানাও—ছোরাই বানাও।"

অশিক্ষিত সরল দাশু—এতক্ষণ কোন রকমে গোপন বৃত্তান্ত চেপে রেখেছিল। এই সহানুভূতির কথায় সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। দু-চোখ তার জলে ভরে এলো। ভারী গলায় সে বললো, "বলতে ? এ্যাঁ, বলতে তুমি ?······এই তো চাই। তোমাদের একটু সহানুভূতি পেলে আর কি চাই ? আর কিছুই চাই না, আর কিছুই—"

কথাটা শেষ করতে পারলো না দাশু। আবেগে তার কণ্ঠ বুজে এলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে গোপনে চোখের জল মুছতে লাগলো। শিকার সামনে দেখে হিংস্র জন্তুর চোখ যেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, মণ্ডলের চোখ দুটোও তেমনি জ্বলে উঠলো। পূর্ণস্বীকৃতি আদায় করতেই হবে। তাই গলার স্বর আরো একটু নামিয়ে মণ্ডল বললেন, "এতে আবার দোষের কি আছে ভাই, গান্ধিজী তো বলেছেন যে নিজের ইজ্জত-রক্ষার জন্য প্রত্যেক মেয়েই সংগে ছোরা রাখতে পারে।"

ওর নিজের সঙ্গে এতখানি একমত কেউ হবে তা দাশু ধারণা করতে পারে নি। সে খুসী হয়ে বললো, "আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ জানি—সেই কথাই তো মাঠানের কাছে শুনে এসে আরম্ভ করলাম।"

এতক্ষণে স্বীকৃতি পেয়ে মণ্ডলমশাই খুব খুসী হলেন। কিন্তু বাইরে আশ্চর্য্য হবার ভাব দেখিয়ে বললেন, "ও, তুমি?"...

আরো বিশদ খবরের তার প্রয়োজন।

মণ্ডল মহাজনকে এরকম অবাক হয়ে যেতে দেখে দাশুর মহা আনন্দ। ছাইগাদা থেকে একটা অর্ধসমাপ্ত ছোরা বার করে সেটাকে গরম করতে দিয়ে দাশু হাতুড়ীটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসলো। তারপর কেষ্টকে হুকুম করলো, "টান্‌রে কেষ্ট, টান্।...এই তিন দিনে বিয়াল্লিশটা, নারে কেষ্ট, বানানো হয়ে গেছে। বিলিও হয়ে গেছে।"

মণ্ডল মশাই মোড়াটা নিয়ে বন্ধুত্বের ভংগীতে দাশুর দিকে একটু এগিয়ে বসে বললেন, "ও, তাই বল—আমি ভাবছিলাম, এমন কারিগর দাশু ছাড়া আর কে হতে পারে? সবাস ভাই, সাবাস। হ্যাঁ, একটা কাজের মত কাজ করা হয় বটে!"

দাশু এই উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলো, "আরে চাবুক যদি তেমন হয় তো মারের চোটে মরা মানুষও লাফিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে।...এই দেখ না, আমাকেই দেখ—মরিয়া হয়ে গেছি। ...অত্যাচার ওরা কি আজ নতুন করে করছে? তবে?...চাবুকটা নিজের পিঠের ওপর পড়ছে তাই বুঝছি।

ক্রমশ দাশু আরো বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠছে "মণ্ডল, এই আমি বলে রাখলাম—তুমি দেখো, আমার এক ময়নার শোধ হাজার ময়না নেবে, আর দেরী নেই!...তা' না হলে এসব কি, দোকান বন্ধ রেখে—দিন নেই, রাত নেই, এসব করছ কি? ময়নার গয়নাগুলো বেচে ঐ দেখ কত ইস্পাত কিনলাম।"

হাত দিয়ে দাশু ঘরের চারিপাশ দেখিয়ে দেয়। তারপর আগুনে টকটকে লাল ছোরাখানা বার করে হাতুড়ীটা নিয়ে তার ওপর ঘা দিতে দিতে বলে, "অত্যাচার···আর অত্যাচার করবে তো শেষ হয়ে যাবে।···স্ত্রীলোকের গায়ে আর হাত দেছ তো গেছ।···ময়নার মত আর কোন মেয়েকে মারবে তো মরবে···মরবে মরবে···"।

অবিরাম দাশুর হাতুড়ী পড়তে থাকে আর মণ্ডলমহাজনের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

১০

সন্ধ্যার পর আজকাল নানা রকম ব্যাপার ঘটতে থাকে। সেপাইদের রাস্তায় রাস্তায় পাহারা আরো কড়া হয়ে, গাছের ওপরে বনের ফাঁকে বাড়ীর আড়ালে ছেলেদের পাহারাও সজাগ হয়ে ওঠে। দাশু ঘুরে বেড়ায় বগলের তলায় সত্যপ্রস্তুত ছোরা নিয়ে, বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদের বিলি করে···

সেদিনও দাশু চুপি চুপি তার কাজ করছিল। আজকাল সে বড় খুশী, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়, ফিস্ ফিস্ করে মেয়েদের ডাকে, চুপি চুপি কথা কয়ে হাতে কি একটা গুঁজে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে। সেদিনও সে অজয়দের বাড়ীর দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলো, "বৌমা, বৌমা!"

বীণা দরজা খুলে দিয়ে এতরাত্রে দাশুকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললো, 'দাশুকাকা!"

দাশু তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে বললো, "কপাটটা দিয়ে দাও মা, কপাটটা দিয়ে দাও।"

দরজা বন্ধ করে বীণা দাশুর দিকে এগিয়ে আসে। গায়ের চাদরটার ভেতর থেকে একটা নতুন তৈরী ছোরা বার করে দাশু ব্যস্তভাবে বলে, "এই নাও, এই নাও মা—তোমার জন্যে আলাদা করে তৈরী করেছি। এটার ধার বেশী। যদি কখনো···"দাশুর গলাটা ধরে আসে, "যদি কখনো, ভগবান না করুন—ময়নার অবস্থায় পড় মা, এটা কাজে লাগবে। এতে পাপ নেই···শুনলে না, সেদিন মাটান বলছিলেন—"

দাশুর হাত থেকে ছোরাটা নিতে নিতে বীণা বলে, "শুনেছি, দাও আমায়।"

দাশু চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে করে ফিরে এসে বীণার কাছ থেকে ছোরাটা আবার নিয়ে বলে, "তুমি তো এসব জানো না মা, কেমন করে ব্যাভার করতে হয়? বলে দিই—"

ছোরার হাতলটা জোর করে মুঠো করে ধরে দাশু বলে, "এই ধরবে —এই রকম করে, তারপর—" নিজের বাঁ হাত দিয়ে দাশু হৃৎপিণ্ডটা অনুভব করে নিয়ে বলে "মানুষের বুকের বাঁদিকটায় থাকে কলজে—এই যে আমার হাত যেখানে! কোন জানোয়ার যদি কখনো তোমার কাছাকাছি আসে, জানো মা, যদি আসে—তাহলে—এইরকম করে—"

দুটো হাত তুলে কেমন করে ছোরা মারতে হবে দেখাতে যায় দাশু, আর বগলের তলা থেকে আরো আট-দশটা ছোরা মাটীতে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি দাশু সেগুলো কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবাক হয়ে বীণা জিজ্ঞাসা করে, "ও মা! এতগুলি ছুরি কি হবে দাশু কাকা?"

দাশু ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। একটু হেসে সে বলে, "সব মেয়েদের দিতে হবে তো! আচ্ছা—আমি যাই বৌমা, সব সময় কিন্তু সঙ্গে রাখবে, বুঝলে?"...

দাশু বেরিয়ে যায়। তারপর সেখান থেকে চাপাগলায় বলে, "কপাটটা দিয়ে দাও বৌমা—"

*　　　*　　　*

রাত্রি হলে দাশুর মত মণ্ডল মহাজনও পথে বেরোন। তাঁর দোকান বড়, আশপাশের বহু গ্রাম থেকে বহু লোক তাঁর দোকানে আসে, জিনিষ কেনে, সুখদুঃখের কথা বলে। মণ্ডল তাদের উৎসাহিত করেন, নানা রকম কথা

-জের করে নেন—আর মনে মনে সেগুলো নোট করে রাখেন। রাত্রি গভীর হলেই জমিদার-বাড়ীর দিকে সন্তর্পণে তিনি পা চালান।

সেদিন মণ্ডল পেয়েছেন জোর খবর—দাশুর নিজের মুখের স্বীকৃতি। বখ্‌শিসের পরিমাণের কথা উৎফুল্ল চিত্তে ভাবতে ভাবতে তিনি জমিদার বাড়ীর গেটের কাছে এসে পৌছুলেন। অন্ধকারে চারিদিকে শাস্ত্রীপাহারা, মাঝে মাঝে সার্চলাইটের কড়া আলো ঘুরে ঘুরে চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

দূর থেকে মণ্ডলকে দেখে শাস্ত্রী হাঁকলো, "Halt! Who comes there?"

প্রায় প্রতিদিন এখানে এসে আদব কায়দা শিখে নিয়েছেন মণ্ডল মশাই। হাসি মুখে জবাব দিলেন, "Friend."

শাস্ত্রী হাঁক্‌লো, "Pass friend, All's well!"

মণ্ডল মশাই ঢুকে পড়লেন ঘাঁটীর ভিতর।

* * *

মেজর ত্রিবেদী তখন তাঁর এলাকার গ্রামগুলো থেকে বাছাই করে মুসলমান মোড়লদের ডেকে এনে তাঁদের সংগে কথা বলছেন, "আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনারা এ সহ্য করছেন কি করে? ওরা যে 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' করে চেঁচাচ্ছে, সে হচ্ছে ঐ হিন্দু-কংগ্রেসের যা-ইচ্ছে-তাই করার স্বাধীনতা।" মুসলমানদের দুঃখে মেজর একেবারে গলে পড়ছেন, "আর করছেও তো ঠিক তাই, কিন্তু কষ্ট পাচ্ছেন তো সমভাবে আপনারাও। এই দেখুন না—ওরাই মারলে এক মুসলমান সেপাইকে—কিন্তু তার জন্যে আপনাদের সকলকেও পাইকারী জরিমানা দিতে হচ্ছে।"

একজন মোড়ল বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন সাহেব তো একটা কথা বলি। জরিমানা না ধরলেই পারেন—"

মেজর সাহেব পাইপে একটা টান দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "তাই কি করা যায়? গভর্ণমেণ্ট তো পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না—Justice must be for all—"

আর একটু হেসে মেজর ত্রিবেদী টেবিলের ওপর হাতদুটো রেখে ঝুঁকে বসেন। তারপর একবার সব ক'টী মোড়লের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে পাইপে আরো গোটা দুই টান দিয়ে বলেন, "তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি হিন্দু-কংগ্রেসের এই অত্যাচার মানতে না চান—" মেজরের চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে, তিনি বলে চললেন, "ধরুন গিয়ে, একটা দাংগা-হাংগামা যদি লাগিয়ে দেওয়া যায়—মানে, যদি বেধে ওঠে, তাহলেই আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারি। তখন আমি উপরঅলাদের জোর করে বলতে পারি যে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায় এসব কংগ্রেসী গোলমালের মধ্যে নাই—সুতরাং ওদের জরিমানা মাপ করে দেওয়া হোক।"

কথাগুলো শেষ করে মেজর সাহেব আর একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন। সকলেই কিন্তু মাথা নীচু করে বসে রইলেন। একটু পরে একজন মাথা তুলে বললেন, "সাহেব, বুঝেছি আপনার কথা। কিন্তু মাপ করবেন সাহেব, ওকাজটী আমাদের দ্বারা হবে না।"

ওঁদের মধ্যে যিনি মৌলভী স্থানীয় তিনি কোরানের একটি বয়েৎ বললেন। মেজর অল্প রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এর মর্ম হোল কী?"

আর একজন মোড়ল বলে উঠলেন, "এর মর্ম হোল সাহেব—কোরান বলছেন, আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত আমলনামায় লেখা হয়ে যাচ্ছে। মরবার পর যাবার জায়গা আছে দুটো—বেহেস্ত্ আর দোজখ্। ভাল কাজ করলে বেহেস্ত্ আর মন্দ কাজ মানে যে কাজ তুমি করতে বলছ তা করলে একেবারে দোজখ্।'

মেজর একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না না, আমি ঠিক ঐ রকম করতে বলছিনে—

মেজর সাহেবের কথা শুনে মোড়লরা এতক্ষণ রাগে ফুলছিলেন। একজন আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—"তা ছাড়া আর কি সাহেব? আমরা হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাইয়ের মত যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছি। সহরের কথা ছেড়ে দিন, সহরের ব্যাপারই আলাদা। কিন্তু গ্রামে আমাদের মধ্যে কখনও কোনদিন ঝগড়াঝাঁটি নেই। তাই সাহেব, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধিয়ে আমরা নেমকহারামি করতে পারব না"...

মেজর বুঝলেন ব্যাপার অন্যদিকে গড়িয়েছে—তিনি যা আশা করেছিলেন, তা সম্ভব হ'ল না। এবার তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বরও নরম থেকে ক্রমশ গরম হয়ে উঠল। আর একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিভে যাওয়া পাইপটা ধরাতে ধরাতে বললেন—"আপনাদের শেষ কথাগুলো আমি শুনি নি বলেই ধরে নিচ্ছি। আমি যা বললাম, ভাল করে ভেবে দেখবেন।... গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করলে আপনাদেরও ভাল হবে।" ক্রূরতা ফুটে উঠল মেজরের চোখে মুখে, তিনি বলে চললেন—"অবিশ্যি না করলে আমাদের এমন কিছু অসুবিধা নেই। সেপাইদের ব্যারাকে হিন্দু-মুসলমান সব মেয়েরই জায়গা হবে। আচ্ছা, আপনারা আসুন।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মুসলমান মোড়লরা। তারপর মৌলভী সাহেব কোরানের আর একটি বয়েৎ আবৃত্তি করলেন।

মেজর বললেন—"এর মর্ম হোল কি?"

একজন মোড়ল এগিয়ে এসে বল্‌লেন—"মর্মকথা আমি বুঝিয়ে বলছি সাহেব। কোরান বলছেন, যে ভাল কাজ করে সে বেহেস্তে যাবে

স্বর্গে যায়; আর মন্দ কাজ মানে তুমি যা বলছিলে না—ঐ মেয়েদের উপর অত্যাচার—তা যদি কর, তবে খোদাতালা তোমাকে নরকে পাঠিয়ে দেবেন।"

এতক্ষণ অনেক কষ্টে রাগ সামলে ছিলেন মেজর ত্রিবেদী। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। চেঁচিয়ে উঠলেন—"Get out !"

মুসলমান মোড়লরা দ্রুতপদে চলে গেলেন। মেজর নিজের কাজে আবার মন দিতে যাবেন, এমন সময় পাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন মণ্ডল মশাই। মুখে তাঁর জয়ের হাসি। দ্রুত এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মেজর সাহেবকে সেলাম করে উঠে দাঁড়ালেন মণ্ডল মশাই। হাত দিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে মেজর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মণ্ডলের মুখের দিকে চাইলেন···

*   *   *

মণ্ডলকে বিদায় দিয়ে মেজর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন।

"এত বড় সাহস! আমারই চোখের সামনে আমার সেপাইকে খুন করার ব্যবস্থা!" পায়চারী ক্রমশ দ্রুত হয়ে উঠতে লাগলো। মেজর চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ক্যাপ্টেন সিং—"

একটু পরে ক্যাপ্টেন প্রবেশ করলেন। তাঁকে বললেন—"আমাদের এখনি বেরুতে হবে। লোকজন ঠিক করুন।"

বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। মেজর ও ক্যাপ্টেন দু'জনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। দেখলেন অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী থেকে একজন সেপাইকে নামান হচ্ছে—ছোরার আঘাতে সে গুরুতর আহত।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মেজর—"How could this happen ? How could this happen ? ···লে যাও, জলদি হাসপাতালমে লে যাও !"

সারা মিলিটারী-ব্যারাক মেজর সাহেবের গর্জ্জনে চঞ্চল হয়ে উঠল! মেজর বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলেন।

গভীর রাত। দাশু একমনে বসে ছোরায় সান দিচ্ছে। সামনে বসে কেষ্ট ঢুলছে, আর সান দেওয়ার যন্ত্রটাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। হঠাৎ দূরে মিলিটারী-ট্রাকের আওয়াজ শুনে দাশু একবার চকিত হয়ে উঠলো। তারপর ভাবলো—"না, এদিকে তো নয়। সারারাত ওদের চলাফেরা চলে। অন্য কোথায় যাচ্ছে বোধ হয়।" দাশু আবার কাজে মন দিলো।

কিন্তু নাঃ—এ দিকেই ত আসছে। গাড়ীর আওয়াজ ক্রমে আরও জোর হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল দাশু। কেষ্টকে একবার সজাগ করে দিয়ে, হাপরের পাশে মাটির গাদায় ছোরাগুলো কোন রকমে লুকিয়ে রাখলো। উত্তেজনায় তার সারা দেহ থর থর করে কাঁপছে। দাশু বুঝতে পেরেছে আজ এসেছে তার শেষ বোঝাপড়ার দিন—ময়নার কাছে যাবার দিন।

ইতিমধ্যে গাড়ীগুলো এসে থেমেছে দাশুর বাড়ীর সামনে। ঝাঁপের উপর এসে পড়ছে বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো। কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব সংযত করে দাশু বললে—কে?

অপর দিক থেকে কোন জবাব এলো না। কিন্তু একটু পরেই ঝাঁপ ভেঙে ঢুকলো এক সেপাই। পুরো দরজাটা সে খুলে দিলো, আর পিছু পিছু অনেক সেপাই চারিদিক তছনছ করে সার্চ করতে শুরু করে দিলো। দাশু নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেষ্ট ভয়ার্ত্ত চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। একজন অফিসার এগিয়ে এসে এদের দেহ সার্চ করলেন—কি জানি, যেমন ভয়ানক লোক—হয়তো ছোরাছুরি লুকিয়ে রাখতে পারে।"

ধীর পদে মেজর এসে ঢুকলেন। একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে দাশুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। চোখে তাঁর প্রতিহিংসার জ্বালা, মুখে কিন্তু মৃদু হাসি।

একটা সেপাই এই সময়ে মাটির গাদা থেকে ছোরাগুলো বের করে মেজরের কাছে নিয়ে এলো। সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে মেজর হাতের ছোট বেত নাচাতে নাচাতে একটু এগিয়ে এলেন দাশুর কাছে। কবলিত শিকারকে নিয়ে হিংস্র জন্তু যেমন খেলা করে, সেইরকম ভাবে স্থির গলায় বললেন—"তুমি এগুলো তৈয়ারী করছিলে?"

দৃপ্ত কণ্ঠে দাশু জবাব দিলো—"হ্যাঁ—"

মেজরের গলার স্বর আরোও ধীর, আরোও কঠিন হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—"আর সব কোথায়?"

ধারাল ছুরির মত এলো দাশুর জবাব—"যাদের তরে তৈরী করেছিলাম, তাদের কাছে চলে গেছে।"

"তারা কারা?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

মরিয়া হয়ে উঠছে দাশু, আজ শেষ দিনে কোন-কিছুতেই সে পেছিয়ে থাকবে না। বুক ফুলিয়ে সে জবাব দিল—"রক্ত যখন ছুটবে, তখন জানতে পারবে।"

বেয়াদপি আর সহ্য করতে পারলেন না মেজর। ঠাস করে গালে এক চড় বসিয়ে বললেন—"চোপ রও Bloody Swine. ঝিলের কাছে কাকে কাকে ছোরা দিয়েছিলে?"

চড়ের অপমান সহ্য করে নিয়ে দাশু বললে "সব তো মনে নেই।"—

ধমক দিয়ে উঠলেন মেজর—"যেগুলো মনে আছে, বল।"

সবেগে ঘাড় নেড়ে দাশু বললে—"না।"

"না বললে গায়ের চামড়া খুলে দেখব—" দাঁত ঘসে মেজর বললেন।

মৃদু হেসে দাশু বল্‌লে—"কি দেখবে? লালচে মাংস, সাদা হাড় আর রক্ত? তোমার চামড়া খুললেও তাই দেখা যাবে সাহেব।"

মেজরের ঘুসি এসে পড়লো দাশুর মুখে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—Shut up.

ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। হাতের উলটা পিঠ দিয়ে একবার সেটা মুছে নিয়ে দাশু বললো—"কাকে ধমকাচ্ছো সাহেব। মরীয়া মরতে ভয় পায় না। তাকে ধমকে কি হবে?"

হঠাৎ গলার আওয়াজ নরম করে ফেললেন মেজর।

"হ্যাঁ, মরবে তুমি ঠিকই। তবে বাঁচবার রাস্তা আমি করে দিতে পারি যদি তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো, যদি বলে দাও—ঝিলের কাছে আমাদের সেপাইকে আজ কে খুন করেছে।"

চমকে উঠলো দাশু। আনন্দে গর্ব্বে তার বুক ফুলে উঠলো। সে বললো—"এঁ্যা? দাঁড়াও, দাঁড়াও—কি বললে? ঝিলের ধারে আজ একটা সেপাই খুন হয়েছে?"

এত বড় সুখের কথা দাশু যেন আর কখনও শোনেনি।—হেসে উঠলো সে—আর একটা জানোয়ার গেছে। ভগবান তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ।"

উপরের দিকে মুখ তুলে হাত জোড় করে দাশু পাগলের মত হাহা করে হেসে চলেছে। ময়নার মৃত্যুর প্রতিশোধ একটার পর একটা শুরু হয়ে গেছে।

ওকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম দিয়ে মেজর বেরিয়ে গেলেন।

দাশু কিন্তু কিছুতেই যাবে না। সেপাইদের সমস্ত মার সমস্ত ধাক্কা উপেক্ষা করে সে যা সামনে পাচ্ছে তাই জড়িয়ে ধরছে, আর চিৎকার করে বলছে—"আমি এখন গেলে আমার এসব কাজকর্ম্ম করবে কে? আমি যাব না। বেঁচে

থাকতে আমি যাব না। হাত পা বেঁধে আমাকে নিয়ে যেতে পার। আমার ময়নাকে যেমন করে নিয়েছিলে পশুদের কাছে।”

দাশুর চিৎকারে তখন চারিদিকে লোক জমা হয়েছে। মিলিটারীর ভয়ে সকলে আনাচ-কানাচ থেকে উঁকি মারছে। মেজর তখন তাঁর গাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছেন। পেছন ফিরে দেখলেন, দাশু তখনও চেঁচাচ্ছে—“আমি যাব না, আমি যাব না।” অত্যন্ত শান্ত মুখে তিনি ক্যাপ্টেন সিংএর দিকে ফিরে বললেন—“এমনিতে যখন ও যেতে চাইছে না, তখন দড়ি দিয়ে ট্রাকের সঙ্গে বেঁধে ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাবেন।

মেজরের গাড়ী দ্রুতবেগে চলে গেল।

দাশুকে ততক্ষণে ধরাধরি করে ট্রাকের কাছে এনে ফেলেছে। ট্রাক থেকে একটা দড়ি বার করে তার হাত-পা বাঁধা হচ্ছে। দাশু চিৎকার করছে—“হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁধ—বেঁধে নিয়ে চলো। জানোয়ারগুলো এমনিতে পারলে না। আমার ময়নাকেও পারে নি—”

ট্রাক ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। দাশু তখন বলছে—“শোন আলিগ্রামের ভাই সব, অজয়কে বোলো—তাঁদের এই খবর দিও। তাঁদের বোলো, আমি আমার সাধ্যমত কাজ করেছি। আমার কাজ আমি করেছি।”

গাঁয়ের লোকেরা এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। দু’চোখ বেয়ে তাদের জল পড়ছে। দূর থেকে তখনও যেন দাশুর কণ্ঠস্বর তাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে। “আমার কাজ আমি করেছি—আমার কাজ আমি করেছি।”

১১

মিলিটারীর চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও কংগ্রেস কর্মীদের কাজ ঠিকমত চলছে—কখন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কী নির্দেশ আসে, আলিগ্রাম আর চারপাশের গ্রামের কর্মী ছেলেরা গোপনে তার জন্তে নিজেদের প্রস্তুত রাখছে। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় তাদের গোপন বৈঠকও বসছে। গ্রামগুলির জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভালবাসে—তাই গোপনতা বজায় রাখার কোন অসুবিধাই ঘটছে না।

সম্প্রতি জেলা কংগ্রেস থেকে একটা নির্দেশ এসেছে—সেটার সম্বন্ধে সকলের অভিমত নেওয়া প্রয়োজন। তাই অজয়, রশীদ এরা এক বৈঠক ডেকেছে মাধব জেলের বাড়ী। চারিদিকে ছেলেদের কড়া পাহারা—মাধব নিজে বাইরে পাহারায় বসেছে—হাতে জাল বুনে চলেছে, কিন্তু চোখ-কান সজাগ। এক এক করে যে সব কর্মী এসে জুটছে তাদের সাংকেতিক কথা জিজ্ঞাসা করে তবে ছাড়ছে। ঘরের ভিতর অজয়, রশীদ, বিনোদ প্রভৃতি আলিগ্রামের অন্যান্য ছেলের দল ব'সে আছে। এক এক করে প্রায় সকলে যখন এসে জুটলো তখন অজয় উঠে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় বিভিন্ন গ্রামের নাম ধরে ডাকতে লাগলো—সকলে এসেছে কিনা দেখবার জন্য।

অজয় ডাকলো :—সিজবেরিয়া

একজন সাড়া দিল :—অনিল হাজরা

এমনি করে একে একে হরিখাল, মহম্মদপুর, আমড়াতলা, বাহাদুরপুর, গৌরচক, ভগবানপুর, জয়নগর, লালগোপালচক প্রভৃতি নাম ডাকা হোল।

যারা যে গ্রাম থেকে উপস্থিত হয়েছে তারা সাড়া দিয়ে উঠলো। সব নাম ডাকা হবার পর দেখা গেল তিনজন ছাড়া সকলেই উপস্থিত আছে।

অজয় বল্‌লো, "আমাদের জাতীয় সরকার স্থাপনের জন্ত নতুন যে আদেশ জেলা কংগ্রেস থেকে আমি পেয়েছি, সেটা পড়ছি শুনুন—"

আগ্রহে ছেলের দল উন্মুখ হয়ে উঠলো। এতদিনের কষ্ট-স্বীকার তাহলে সার্থক হবে—সুস্পষ্ট আদেশ যখন এসেছে তখন বৃহৎ একটা ঘটনার সম্মুখীন তাদের হতে হবে। অজয় পড়তে লাগলো, "গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার দিন দিন এত ভীষণভাবে বাড়িতেছে যে আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীনতা-ঘোষণা করিতে হইবে। তথাপি, আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইলে আরো কিছু সময় দরকার। তাই আপনারা সকলে অনুমোদন করিলে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ ঘোষণা করিব স্থির করিয়াছি। ঐ দিন গভর্ণমেণ্টের সব কিছু অহিংস সংগ্রাম দ্বারা দখল করিতে হইবে।"

পড়া শেষ ক'রে কাগজটা মুড়ে রাখতে রাখতে অজয় আবার বললো, "এখন বলুন, এই সিদ্ধান্তে আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে কি না?"

ছেলের দল তো এই রকম একটা নির্দেশই চাইছিল—কাজে কাজেই তাদের সমর্থন পেতে একটুও দেরী হোলো না।

অজয় আবার বল্‌লো, "আজকে ২২শে আগস্ট—২৯শে সেপ্টেম্বর আমরা তাহলে এ এলাকায় সরকারী যা-কিছু আছে দখল করার জন্য প্রস্তুত হতে পারবো, একথা আমি জেলা-কংগ্রেসকে জানাতে পারি?"

এবারেও সকলের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল। বৈঠকে এ-ও স্থির হোলো যে কংগ্রেসের সেক্রেটারী সুশীলবাবুকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন আগামী সংগ্রামে এ এলাকায় অজয়কেই প্রথম সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হোক। অজয় যদি ধরা পড়ে তাহলে তার পরে রশীদ সর্ব্বাধিনায়কের পদে উন্নীত হবে। কারো

নাম ধরে আর ডাকা চলবে না—এক নম্বর, দুনম্বর এমনিভাবে প্রয়োজন হলে পরস্পরকে ডাকতে হবে। যুদ্ধের সৈনিকদের মত সর্বাধিনায়কের আদেশ পালন করতে হবে।

একজন অনুযোগ করলো, "আমাদের কাজকর্মের কথা গ্রামবাসীরা ঠিক মত জানতে পারছে না—তাদেরও প্রস্তুত হতে হবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছু করা দরকার।"

তখন তার প্রস্তাব মত সাইক্লোস্টাইল-করা "বিপ্লবী" নামে বাংলা দৈনিক কাগজ বের করা স্থির হোল। এর জন্য দু'টা মেশিন জোগাড় করতে দু'টী ছেলে তখনই কোলকাতায় রওনা হোল।

কোন কিছু করবার না পেয়ে ছেলের দল চঞ্চল হয়ে উঠছিল—এবার হাতে কাজ পেয়ে তারা অদম্য উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে গেল। রাতারাতি চার পাঁচ শ' পোষ্টার তারা লিখে ফেললো। বিভিন্ন গ্রামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাজারে, হাটে, দোকানে, ইস্কুলবাড়ীতে এক রাতের মধ্যে সেগুলো লাগানো হয়ে গেল।

আলিগ্রামের বাজারেও পোস্টার লাগানো হয়েছিল। সেদিন সকালে বাজারে খুব হৈ হৈ সুরু হ'য়ে গেল—এতদিন ছেলেদের কোন খবর তারা পায় নি। আজ হঠাৎ তারা কী নোটিশ জারী করেছে, তাই দেখার জন্য ভীড় হয়ে গেল। কেউ চেঁচিয়ে পড়ছে, যে পডতে জানে না সে শুনতে না পেয়ে চেঁচামেচি করছে। কেউ বা এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। গোলমাল শুনে মণ্ডলমশাই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা কী দেখবার চেষ্টা করলেন। এমন সময় হরি মোড়ল সেখানে এসে পৌছুলো—বয়স্ক লোক তায় আবার মোড়ল, হরিকে তাই সবাই মান্যগণ্য করে। সবাই চেঁচামেচি করে উঠলো, "মোড়লভাই, তুমি বুঝিয়ে দাও—কি লিখেছে ছেলেরা।"

হরি পোস্টারটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে বললো, "আহা, তোমরা চুপ করো না—তবে তো বুঝিয়ে দেবো। সবাই মিলে কথা বললে আমিই বা বোঝাবো কি আর তোমরাই বা বুঝবে কি ?"

সকলে চুপ করলো, হরি বললো, "আমাদের গাঁয়ের সব চেয়ে সেরা ছেলে অজয়—যে এখন এ এলাকার কংগ্রেসের কর্তা নির্বাচিত হয়েছে—সে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর তোমরা স্বাধীন-ভারতের স্বাধীন অধিবাসী হবে।"

আবার সকলে চেঁচামেচি কোরে উঠলো, "কবে ? কি করে হবে ?"

হরি বল্‌লো, "দাঁড়াও না বাপু, বলছি—তোমরা ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে হে !···এই দেখ না লিখেছে—"

হরি পোস্টার থেকে পড়তে সুরু করলো, "ঐ দিন জেলা-কংগ্রেসের নির্দেশানুযায়ী গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ অহিংসভাবে সরকারের কাছারী, আদালত, পোস্টাপিস, থানা, সৈন্যশিবির ইত্যাদি সব কিছু দখল করিতে হইবে এবং ঐদিন হইতে সকলে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নরনারী বলিয়া নিজদিগকে জ্ঞান করিবে। ২৯শে সেপ্টেম্বরের জন্য তাই সকলে প্রস্তুত হউন। ইতি—

স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর প্রথম অধিনায়ক

অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশ শুনে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলো। হরি মোড়লের আনন্দ সব চেয়ে বেশী—কলরব করতে করতে তাকে ঘিরে সকলে সেখান থেকে সরে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু মণ্ডল মশাই—তাঁর মনের খাতায় হরি মোড়লের নাম ও কথাগুলো ভালো করে তিনি টুকে নিলেন।

*　　　　*　　　　*

হুঁদো অফিসার বলে কর্তৃপক্ষ মহলে মেজর ত্রিবেদীর এতদিন খ্যাতি

ছিল—কিন্তু এখানে এসে এবার তিনি বড় মুস্কিলে পড়েছেন। উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছে জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ বেরোচ্ছে তবু এখানকার [illegible] তিনি কিছুতেই বাগে আনতে পারছেন না। মারধোর করেছেন, ভালো কথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, এমন কি সাম্প্রদায়িক হাংগামা পর্যন্ত বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু কি যে এরা গান্ধীজীর ভক্ত, কিছুতেই এদের টলাতে পারেন নি! ভেবেছিলেন মিটিং-এর পর ছোঁড়াগুলো এখান থেকে ভয়ে পালিয়ে গেছে—এতদিন পরে আবার তাদের পোস্টার দেখে তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তারপর সেদিন রাত্রে মণ্ডল মশাইয়ের কাছে খবর পেলেন, পোষ্টার পড়তে হরি মোড়লের আগ্রহের কথা। আর স্থির থাকতে পারলেন না মেজর সাহেব—পরদিন সকালেই গাঁয়ের সব মাতব্বরদের ডাকিয়ে আনালেন। অজয়ের লেখা পোষ্টারও একখানা তাঁর কাছে এসে পৌছেছে। মাতব্বরদের তিনি বললেন ছেলেদের খবর তাঁকে দিতে।

সকলেই যখন না জানার ভাণ করে বসে রইলো তখন মেজর সাহেব আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, হাতের পোস্টারটা মাতব্বরদের মুখের সামনে নেড়ে কঠিন স্বরে বললেন, Where is this blessed dictator? Where is he? আমাকে কি এইটেই বিশ্বাস করতে হবে যে সব কটা গ্রামে এক রাতে অসংখ্য এইগুলো লাগানো হোলো—আর আপনারা তার কিছুই জানেন না?"

সকলেই মাথা নীচু করে চুপ করে আছেন। মেজর সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ হরি মোড়লের উপর পড়লো—রাগে চটে উঠে তিনি বল্লেন, "আপনি কি বলেন?"

চমকে উঠে হরি বললো, "আমি?"—

"হ্যাঁ-হ্যাঁ—আপনি—"চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর।

আমতা-আমতা করে হরি জবাব দিল, "আমি—মানে আমি কিছু জানি না।"

"হুঁ!" ব্যংগ করে উঠলেন মেজর "কিন্তু অজয় যে এই গ্রামের সেরা ছেলে, তা জানেন তো?" সেই অজয় সম্পর্কেই কিছু বলুন না। কবে থেকে আপনারা—ঐ যে কী বলে—স্বাধীন হবেন?"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর একেবারে মোলায়েম করে আনলেন মেজর। তারপর বললেন, "শুনুন, আমি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক—কোন গোলমাল আমি পছন্দ করি না। তাই আমার এই এলাকায় শুধু শান্তিরক্ষার জন্যই আপনাদের সাহায্য চাইছি।"

মণ্ডল মশাই এতক্ষণ সকলের মধ্যে ভিজে বেড়ালটির মত বসে ছিলেন। তিনি হাতজোড় করে বলে উঠলেন, "সত্যিই স্যার, বিশ্বাস করুন, আমরা এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। স্যার জানলে—"

বাধা দিয়ে মেজর সাহেব বললেন "আমি বিশ্বাস করি না। এটা কোলকাতা সহর নয়—আপনাদের সাহায্য ছাড়া ওরা এই ছোট গ্রামে এতদিন কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে পারে না।"

মেজর সাহেবের কণ্ঠস্বর মোলায়েম কিন্তু বলার ভংগী ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠলো, মৃদু হেসে তিনি বললেন, Anyway I shall give you another chance. যদি আপনারা এই অজয়, রশিদ আর অন্য সব ক'টা ছোকরাকে ধরিয়ে না দেন, তাহলে পরের অধ্যায় কি হবে তাও জেনে রাখুন।"

হাতের পাইপের আগাটা দিয়ে সকলকে ইংগিত করে আরো মোলায়েম করে তিনি বললেন, "সব কটা মোড়লের বাড়ী আমি মাটির সংগে চষে মিশিয়ে দেব। ষাঁড়গুলোর কথা আমি ভাবি না—এখানে ওখানে ঘুরে নিজেদের যা হোক ব্যবস্থা তারা করে নেবে। তবে গাই গরুগুলোর

দায়িত্ব আমার। ওদের একটা ভালো গোয়ালের বন্দোবস্ত আমি করে দেবো, এ প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিলাম।"

মাতব্বররা সকলে শিউরে উঠলেন। মেজরের একথার অর্থ যে কি, তা বুঝতে কারো বাকী রইলো না। নীচু স্বরে তাঁরা পরস্পরের সংগে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। আড়চোখে একবার ওঁদের ভয়-ব্যস্ততা দেখে নিয়ে মেজর পাইপ ধরাতে লাগলেন। তারপর ওঁদের দিকে ফিরে তেমনি স্বরে মৃদু হেসে বললেন, "না-না-না—তাড়াতাড়ি কিছু নেই। এখন বেলা ন'টা—বারো ঘণ্টা সময় আমি আপনাদের দিচ্ছি। ঠিক রাত্রি ন'টায় আপনাদের আমি আবার এখানেই দেখা পাবো, আশা করছি। যদি তা না হয়, আমার দেখা যে আপনাদের ওখানে পাবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—"

বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে মেজর শেষ করলেন, "মোট কথা, দেখা আমাদের হবেই।"

স্তম্ভিত হয়ে মাতব্বররা বসে রইলেন। একদিকে কংগ্রেস, স্বরাজ, দেশের ছেলের দল—অন্যদিকে অর্থ সম্পদ মান ইজ্জত···

ওঁদের মানসিক অবস্থাটা বুঝে নিতে মেজরের দেরী হোল না। মনে মনে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন—এত দিনে ঠিক জায়গায় ঠিক ওষুধ দিতে পেরেছেন। ওঁদের সামলে নেবার একটু সময় দিয়ে ক্যাপ্টেন সিংকে ডেকে গাড়ীতে করে ওঁদের পৌঁছে দিয়ে আসতে বললেন।

*　　　*　　　*

মণ্ডলের দোকানঘরেই মিটিং বসেছে—সেই সকালে মেজর সাহেবের ওখান থেকে আর কেউ বাড়ী যাবার পর্যন্ত সময় পান নি—একই আলোচনা, একই তর্ক বারবার করেও তাঁরা কোন নিষ্পত্তিতেই পৌঁছতে পারছিলেন

না। তর্ক যত জমাট বাঁধছে, তত বেশী মাথা গরম হয়ে উঠছে—আলিগ্রাম বিশ্বাসঘাতকতা করবে? কিন্তু না করলে, ভিটেমাটি উচ্ছন্ন যাবে, স্ত্রীলোকের ইজ্জত বিপন্ন হবে।

সকলেই নিজের মত জাহির করতে ব্যস্ত—চেঁচামেচি করে করে সকলেরই প্রায় গলা ধরে গেছে, এখন কেউই প্রায় কারুর কথা শুনছেন না, এত বড় বিপদের সম্মুখীন তাঁরা আর কখনো হন নি।

হরি সকলকে থামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "আহা-হা চুপ করো, চুপ করো—হাতজোড় করছি ভাই, একটু থামো। এ রকম করে শুধু শুধু চেঁচামেচি করলে বারো ঘণ্টা কেন বারো বছরেও তো আমরা কোন একটা মীমাংসায় আসতে পারবো না। আর সময়টাও তো একটু খেয়াল করতে হয়, এদিকে আটটা বাজে যে ··

চক্রবর্তী মশায় সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, হাত-পা ছুঁড়ে তিনি হরিকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "আমার কথা হল এই যে, আমরা তো বুড়ো হয়েই গেছি। আজ বাদে কাল তো এমনিতেই মরবো। তবে আবার আমাদের মরবার ভয়টা কিসের?"···

মণ্ডল মহাজন এতক্ষণ বকাবকি করে কয়েকজনকে তার নিজের মতে এনেছিল! চক্রবর্তীর কথায় সব উলটে যায় দেখে সে তাড়াতাড়ি বললো, "আরে না, না, না,···কথা তো তা নয় চকোত্তি মশাই, মরতে আবার ভয় কি?"···

চক্রবর্তী মশাই বাধা পেয়ে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বল্লেন,—"তবে?"

মণ্ডল বললেন, "এই তো সেদিন ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। মরবার জন্যে তো প্রস্তুত হয়েই গেলাম! কিন্তু কথা তো তা নয়—"

চক্রবর্ত্তী মশাইর মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেছে। তিনি রেগে উঠে বললেন,"কি বলতে চাও, সোজা করে বলো না বাপু—"

মণ্ডল মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "সারাদিন ধরেই তো তাই বলছি। কথা হচ্ছে, ধর্ম—বিশেষ করে ঐ মেয়েদের ধর্ম। সাহেবের শেষ কথা-গুলো মনে নেই? এই ধর্ম যাওয়া মানে, উর্দ্ধতন চোদ্দপুরুষ আর অধস্তন চোদ্দপুরুষ—এই আটাশ পুরুষ এক সংগে নরকস্থ হওয়া। তাই কথা হোল, এ সইব কেমন করে?…

মণ্ডলের কথায় চক্রবর্ত্তী মশায় চুপ করে গেলেন—সত্যিই তো, এদিকটা তো তিনি ভাবেন নি। ধর্ম ছেলেখেলা তো নয়! না, না…

হরি কিন্তু কিছুতে একথা মানতে রাজী নয়। সে বললো, "দেখ মণ্ডল, অজয় রশিদ ওদের ধরিয়ে দিলেই কি যাদের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে তারা ইজ্জত ফিরে পাবে? দাশু কামারকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে—তার মরা ধড়ে আবার প্রাণ আসবে? মণ্ডল, তুমি দেখো, শুধু ওদের ধরেই ওরা ক্ষান্ত হবে না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের সকলকে ওরা কুকুরের অধম না করতে পারছে, ততদিন ওদের অত্যাচার থামবে না, কিছুতেই থামবে না।"

হরির কথায় এবার চক্রবর্তী মশাই খুশী হয়ে উঠলেন। অন্য অনেকেই সায় দিল। মণ্ডল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হরি বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বলে চললো, "না মণ্ডল, শালারা যা খুশী করুক, আমরা ভয় করি না। ধরিয়ে তো তাদের দেবই না—যদি কখনো ওরা এমনিতেই ধরা পড়ে, ওদের জায়গায় যাতে আরো শতশত অজয় রশিদ আসে—তার চেষ্টা আমরা করবো।"

এবারে সকলেই হরির কথায় রাজী। মণ্ডল মশাই দেখলেন এখন উলটো

কথা বল্‌লে এরা সন্দেহ করতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি তিনি বললেন, "ব্যস্‌, ব্যস্‌, ঠিক কথা, এ কথার পর আমার আর কিছু বলবার নেই, কিচ্ছু বলবার নেই—"

দেশপ্রেমের জোয়ার এসে গেল মণ্ডল মশাইয়ের মনে—হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তিনি চীৎকার করে বলে উঠলেন, "তা হলে একবার বলো ভাই, বন্দেমাতরম্‌।"

জীবনপণ করতে পেরেছেন, তাই সকলেই খুশী, বুড়ো বয়সেও হাত-পা ছুঁড়ে বালকের মত তাঁরা সাড়া দিলেন, "বন্দেমাতরম্‌"···

"স্বাধীন ভারতকী—"

খুশী মনেই সবাই বেরিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় পিছন থেকে মণ্ডল মশাই আবার ডাকলেন, "হরি, ভায়া শোন শোন—"

অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গাঁয়ের বৃদ্ধ এঁরা—সরল মনে কথা বলেন। মণ্ডলের বুদ্ধির কাছে এঁরা একেবারে বালক। মণ্ডল এগিয়ে এসে বললেন, "আমার একটা ছোট্ট বিষয় জানবার আছে। এর পর তো মিলিটারীর আবির্ভাব হল বলে! তা বাড়ীর মেয়েদের কি বাড়ীতেই রাখবো, না, অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো ?"

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো সকলের। সত্যিই তো, মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করা হয় নি। হরি মোড়ল কিন্তু পেছিয়ে যাবার লোক নয়, একটু ভেবে নিয়ে সে বল্‌লো, "এটা একটা কাজের কথা তুলেছ বটে মণ্ডল। তা সব বুঝেসুঝে মেয়েদের বাড়ীতেই বা রাখবো কেন ? পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও—যে যেখানে পারো পাঠিয়ে দাও।"

আর একটি বৃদ্ধ বললেন, "তাই যদি তোমরা ঠিক করো, তাহলে গ্রামের আর সবাইকে বলতে হয়। ধর এই অজয়ের বাড়ী, রশীদের বাড়ী—"

মণ্ডল বল্লেন, "নিশ্চয়, খবর দিতে হবে বই কি! অজয়ের বাড়ী আমি যাচ্ছি—ওর ছেলের জন্য একটা হর্লিক্স্ সংগ্রহ করে রেখেছি—সেইটে দিয়ে আসবো। আমিই বলে দেব'খন। তোমরা আর দেরী কোরো না—বেরিয়ে পড়ো, শীগগির বেরিয়ে পড়ো—হাতে আর এক মুহূর্ত সময় নেই।"

সকলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একটু পরে মণ্ডল মশাই দু' টাকায় কেনা হর্লিকস্ চার টাকায় বেচার জন্যে, আর কথায় বার্তায় অজয়ের কোন খবর যদি বের করতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্যে অজয়দের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

* * *

একমনে নানারকম কথা ভাবতে ভাবতে মণ্ডল মশাই অন্ধকারে অজয়দের বাড়ীর দিকে চলেছেন। ওদের বাড়ীর কাছে মোড় বেঁকে হঠাৎ দেখলেন কে যেন অজয়দের সদর দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি মণ্ডলমশাই রাস্তার পাশে লুকিয়ে পড়লেন—তবে কী সত্যিই ভগবান মুখ তুলে চাইলেন? দাশুর খবরটা দিতে পেরে মেজর সাহেবের কাছ থেকে মোটা বখশিস্ পেয়েছেন, অজয়কে ধরিয়ে দিতে পারলে, নিঃসন্দেহ মোটা এক মিলিটারী কন্ট্রাক্ট। ওদিকে তখন দরজাটা একটু খুলে আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মণ্ডলমশাই পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন যদি সত্যিই অজয় এসে থাকে তাহলে সে যাতে কোন রকম সন্দেহ না করতে পারে। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে ধাক্কা দিতে গিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন। হয় তো তাঁর কাছেও অজয় দেখা দেবে না—তিনি জানতে পেরেছেন বুঝতে পারলে হয়তো এখুনি পালিয়ে যাবে। পাঁচিলের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন মণ্ডল মশাই। কারা যেন ফিস্-ফিস্ করে কথা বলছে। অজয়ই তো বটে, নিঃসংশয়

হবার জন্য মণ্ডল একবার গাছের ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু করে ভিতরে দেখবার চেষ্টা করলেন। তারপর মাথা নীচু করে জমিদার-বাড়ীর পথে দ্রুত পা চালালেন। হর্লিকস্ বেচে দু'টাকা লাভ করার চেয়ে বড় শিকার আজ তাঁর হাতে।···

*   *   *

জমিদারবাড়ীর বড় হল-ঘরে মেজর ত্রিবেদী পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ক্যাপ্টেন সিং, লেফটেনাণ্ট ব্যানার্জি প্রভৃতি অফিসাররা একপাশে আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে মেজর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ন'টা বেজে গেল, বুড়ো শয়তানগুলো তা হলে এলো না? এত সাহস? আচ্ছা দেখাচ্ছি, আপনার লোকজন ঠিক আছে?"

ক্যাপটেন সিং জবাব দিলেন, "হ্যাঁ স্যার!"

মেজর বল্লেন, "আমি এখুনি বেরুবো। ডি, এস, পি. কে খবর দিন, তাঁকেও আমাদের সংগে যেতে হবে।"

পাশের ছোট দরজাটায় খুট করে শব্দ হোলো। মেজর একবার সেদিকে তাকিয়ে অফিসারদের বললেন, "আপনারা যান।"

ওঁরা চলে যাওয়ার সংগে সংগে সেই দরজা দিয়ে মণ্ডল প্রবেশ করলেন। হাতে তখনো হর্লিকস্-এর শিশি। ছুটতে ছুটতে এসে তখনো বেশ জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন। অভ্যাসমত নীচু হয়ে সেলাম করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মণ্ডলমশাই। মুখে তাঁর জয়ের হাসি। বললেন, "স্যার—"

*   *   *

সেদিন টুটুনের জ্বর খুব বেড়েছে—ম্যালেরিয়ায় জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না। অজয়কে দেখার জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে খবর পেয়ে আজ অনেক

কষ্টে সময় করে অনেক লুকিয়ে চুরিয়ে অল্পক্ষণের জন্ত অজয় ছেলেকে একবার দেখতে এসেছে। বীণা ওর মাথায় জলপটি দিয়ে হাওয়া করছে, অজয় থার্মোমিটারে কত জ্বর উঠলো দেখছে।

ঠাকুরমা বারান্দায় পাহারা দিচ্ছিলেন, তাঁর মুখে এক ঝলক আলো এসে পড়লো।

হেড-লাইটের আলো। রাত্রবিরেতে মিলিটারী গাড়ী আজকাল যাওয়া-আসা করে, প্রথমটা ঠাকুরমা তেমন খেয়াল করলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন, গাড়ী বোধ হয় তাঁর বাড়ীর দিকেই আসছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে তিনি ভয়ে ভয়ে অজয়কে বললেন, "অজয়, তুই শীগগির পালা, ওরা বোধ হয় আসছে।"

থার্মোমিটার নামিয়ে রেখে অজয় ছুটে বাইরে গিয়ে একবার দেখে এসে বললে, "হ্যাঁ, ওরা আসছে ঠাকুমা। সাবধানে থেকো। বীণা, দরজা বন্ধ করে দাও।"

অজয় দৌড়ে চলে গেল। ওর গমন-পথের দিকে দুটি শংকাকুল নারী কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাইরে তখন মিলিটারীর দল এসে পড়েছে। বড় শিকার আজ হাতের গোড়ায়—মেজর সাহেব এক মুহূর্ত দেরী করেন নি। সদর-দরজা ভেঙে ফেলে তারা তখন ভিতরের দরজা ঠেলাঠেলি শুরু করেছে। ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে বীণা আর শিবানী ভয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। ঠাকুরমা নিজেও ভয় কম পান নি, এতখানি বয়সে এমন বিপদের সামনে আর কখনো তাঁকে পড়তে হয় নি। তবু ওদের সাহস দেবার চেষ্টা করছেন। একটু পরে তিনি বললেন, "বীণা, ওরা তো ভেঙে ঢুকবে, তার চেয়ে খুলে দি।"

দরজা খোলার সংগে সংগে ক্যাপ্টেন সিং সেপাইদের নিয়ে ঘরে ঢুকে

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "অজয় বাবু কোথায় ?" তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না করে নিজেরাই চারিদিকে খুঁজতে শুরু করলেন।

পাশের ঘর খোঁজা শেষ করে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ব্যানার্জি জানালেন, "এ ঘরে কেউ নেই স্যার।"

চীৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন সিং, Search, Search! Quick!"

বীণা আর শিবানী খাটের ওপর টুটুনের কাছে উঠে বসেছে, খাটের বাজু ধরে ঠাকুরমা কোন রকমে চাঞ্চল্য দমন করার চেষ্টা করছেন। তাঁর দিকে ফিরে ক্যাপ্টেন সিং ধমক দিয়ে উঠলেন, "কোথায় অজয় ?"

শুষ্ক কণ্ঠে ঠাকুরমা জবাব দিলেন, "দেখতেই পাচ্ছো বাবা—এখানে নেই।"

ধমকের মাত্রা বেড়ে গেল। ক্যাপ্টেন সিং বললেন, "এখানেই তো ছিল, কোথায় লুকিয়েছে সে ?"

এতক্ষণে ঠাকুরমা নিজেকে সামলে নিয়েছেন—বুঝেছেন কোন রকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেই ওরা অজয়ের আসার কথা জেনে ফেলবে। কণ্ঠস্বর খুব সংযত করে তিনি বললেন, "বলতে পারি না।"

ক্যাপ্টেন লেফটেন্যাণ্টকে ওঁদের পাহারায় রেখে দৌড়ে বাইরে চলে গেলেন। মেজর ত্রিবেদী তখন বাইরে ট্রাকের পাশে লাঠিতে হেলান দিয়ে বড় শিকার গাঁথার আনন্দে খোসমেজাজে পাইপে টান দিচ্ছিলেন, আর ডি. এস. পি. র সংগে কথাবার্তা বলছিলেন। ক্যাপ্টেন ছুটে আসতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন।

ক্যাপ্টেন বললেন, "স্যার, নেই!"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেজর। একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, "Are you quite sure ?"

ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, "Yes Sir"

পাইপে একটা টান দিয়ে মেজর নিজের মনে বলে উঠলেন, "পালিয়ে গিয়েছে শয়তানটা। আবার অল্প চিন্তা করে বললেন "আর সব ?"

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, "আছে স্যার।"

"নিয়ে আসুন—"

ক্যাপ্টেন চলে যাবার পর কি ভেবে মেজর হঠাৎ ডি. এস. পি.-র দিকে ফিরে বললেন, "আচ্ছা, এই মণ্ডল লোকটা দু'দিকে খবর দিচ্ছে না তো ?"

ডি. এস. পি. বললেন, "না, অতটা সাহস করবে বলে মনে হয় না—"

একটু হেসে মেজর বললেন, "ওর মত লোক পারে না এমন কাজ নেই—"

ক্যাপ্টেন ততক্ষণে ঠাকুরমা, বীণা ও শিবানীকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। শিবানী ভয়ে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর আঁচলে মুখ-লুকিয়ে আছে। বীণা থর-থর করে কাঁপছে—কোন রকমে ঠাকুরমাকে অবলম্বন করে এগিয়ে আসছে। ঠাকুরমা একা মনের ঝড় মনে চেপে রেখে শান্ত মুখে আসছেন। শিবানীকে দেখে মেজর একেবারে মাটির মানুষ হয়ে গেলেন—মোলায়েম কণ্ঠে হাসতে হাসতে তাকে ডাকলেন, "এদিকে এসো তো খুকী। কি নাম তোমার ? এসো, এসো—ভয় কি ? আমি কিচ্ছু বলবো না—"

মেজর যত মিষ্টি কথা বলেন, শিবানী তত ঠাকুরমাকে আঁকড়ে ধরে তাঁর কোলের কাছে মুখ গোঁজে। একটু হেসে মেজর বলেন, "বড্ড ভয় পেয়েছে"—

তারপর হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে হাসির চিহ্ন মিলিয়ে গেল। ঠাকুরমার দিকে ফিরে শান্ত কণ্ঠে যেন খুব সাধারণ প্রশ্ন করছেন এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "অজয় কতক্ষণ পালিয়েছে ?"

ধীরভাবে ঠাকুমা জবাব দেন, "সে তো আসে নি—"

"মিথ্যে কথা।"

তারপর বীণার দিকে হাতের পাইপটা নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি বলেন ? হ্যাঁ, আপনি, আপনি—"

বীণা ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এই ভীষণ লোকটার কদর্য হাসি দেখে, আর ওর ধারালো চোখের চাহনিতে সে বুঝলো, এর হাত এড়াতে পারবে না। তাই সাহস করে মেজরের মুখের দিকে সোজা চেয়ে বললে, "জানি না।"

ধমক দিয়ে উঠলেন মেজর, "সে ছিল এখানে।"

সমান জোরে বীণা জবাব দিল, "না।"

হো-হো করে হেসে উঠলেন মেজর। বললেন, "অর্ধাঙ্গিনী, উঃ! চটপট বলুন, চটপট বলুন। আমার আবার এ গাঁয়ের মোড়লদের বাড়ী যেতে হবে কিনা, অপেক্ষা করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।"

ঠাকুরমা তেমনি স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলেন, "যা জানি না, তা কেমন করে বলবো বাবা ?"

"বলবেন না ? আচ্ছা। কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলেন মেজর। তারপর হুকুম দিলেন, "ক্যাপ্টেন সিং, বাড়ীটায় আগুন লাগিয়ে দিন!"

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক-এর ভিতর থেকে কয়েক টিন পেট্রোল নামানো হোলো। সেপাইরা সারা বাড়ী পেট্রোল ছিটোতে আরম্ভ করলো।

এ রকম অবস্থা ঠাকুরমা বা বীণা কেউ কল্পনা করেন নি। এমন সহজে এত বড় নিষ্ঠুর কাজ যে কেউ করতে পারে, তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। ঘরের ভিতর অসুস্থ টুটুন রয়েছে। ঠাকুরমা হতবুদ্ধি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তোমরা কি করছো বাবা ? কি করছো ?"

চীৎকার করে উঠলো বীণা, "ঠাকুমা, টুটুন—টুটুন রয়েছে যে!"

সেপাইদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে বীণা ভিতরে ঢুকবে—মেজর লাফিয়ে উঠলেন, "থামাও, থামাও একে—"

বীণাকে তখন সেপাইরা আটকে ফেলেছে। ঠাকুরমা ব্যাকুল হয়ে মেজরের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "শিশুটাকে আনতে দাও, বাবা—ও তো কোন দোষ করে নি।"

হাসিতে মেজরের মুখ ভরে গেল। তিনি বললেন "ও দোষ করে নি সত্যি, কিন্তু ওর বাবা দোষ করেছে যে—"

বীণা তখন পাগলের মত হয়ে উঠেছে। সেপাইদের সঙ্গে সে তখন ধস্তাধ্বস্তি করছে আর আবেদন জানাচ্ছে, "আমাকে একটু যেতে দাও—একবারটি! আমার টুটুনকে নিয়ে আসি—তারপর তোমাদের যা-ইচ্ছে-তাই কোরো। আমাকে যেতে দাও—তোমাদের পায়ে পড়ছি—যেতে দাও—"

বীণার দিকে একটু এগিয়ে এলেন মেজর। এ দৃশ্যে সকলেই অল্পবিস্তর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—ডি. এস. পি. তো পিছনে দাঁড়িয়ে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মেজরের মুখে শয়তানী হাসি। বীণাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "আগুন লাগবে না, আপনার টুটুনেরও কিছু হবে না—চটপট তাহলে বলে ফেলুন।"

তবু বীণা অজয় সম্বন্ধে একটা কথাও বলবে না। চীৎকার করছে সে, "আমি জানি না। আমাকে একবারটী যেতে দাও, শুধু ওকে নিয়ে আসি। যেতে দাও, যেতে দাও—

মেজর এবার আগুন লাগাবার হুকুম দিলেন। এক এক জায়গায় পেট্রোলের ওপর দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠি পড়ছে আর দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠছে।

বীণা আর সহ্য করতে পারে না। বুক ফেটে বুঝি চৌচির হয়ে যাবে এবার। যারা ওকে ধরে রেখেছে, তাদের আঁচড়ে কামড়ে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছে। পাগল হয়ে গেছে বীণা। "না—না—ও কি করছো? আমায় যেতে দাও, যেতে দাও আমায়, ঠাকুমা টুটুন···

ঠাকুরমার বুকের ভেতরটা কিসে যেন মুচড়ে দিচ্ছে। তাঁর বংশধর অজয়ের ছেলে! আর তিনি পারলেন না—বলে উঠলেন, "আগুন নেভাতে বল বাবা… আমি বলছি। শোন, অজয় এসেছিল, কিন্তু সে চলে গেছে, কোথায় জানি না—"

খুসী হয়ে উঠলেন মেজর, "এসেছিল? তা হলে স্বীকার করলেন?…একটু বাদে বাকীটাও স্বীকার করবেন।"

আকুল কণ্ঠে ঠাকুরমা বললেন, "না, না বাবা—বিশ্বাস করো, কোথায় গেছে জানি না। জানলে নিশ্চয় তোমাদের বলে দিতাম।"

পৈশাচিক উল্লাস মেজর আর ধরে রাখতে পারছেন না। জোরে হেসে উঠে বললেন "Very good! খুব বেশী দূরে তা হলে নিশ্চয় যেতে পারে নি। এই আগুন দেখে একবার আসবেই।…কি বলেন? ভালো ছেলে!"

এই শয়তানের কোন মমতা নেই। ঠাকুরমা বীণাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। বীণার তখন অর্ধমূর্ছিত অবস্থা, চোখ দিয়ে অবিরল জল ঝরছে আর মুখ দিয়ে অস্ফুটে শুধু বের হয়ে আসছে, "টুটুন, টুটুন—"

আগুনের শিখা ক্রমশ বাড়ীর ভিতরের দিকে, যে ঘরে টুটুন শুয়ে আছে সেই ঘরের দিকে, এগিয়ে চলেছে।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য ডি. এস. পি. আর সহ্য করতে পারলেন না। এগিয়ে এলেন মেজরের কাছে, কানে কানে বললেন, "আমায় মাপ করবেন মেজর। অজয় আসবেই, আপনি ঠিক বুঝেছেন?

অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে আগুনের দিকে তাকিয়ে মেজর পাইপ টানছিলেন। প্রশ্ন শুনে এক নজর তাঁর দিকে দেখে নিয়ে বললেন, "Exactly—"

ডি. এস. পি. আরো চঞ্চল হয়ে বললেন, "কিন্তু যদি না আসে—What will happen?"

মেজর শান্ত স্বরে বললেন, "Nothing ! Simply we shall set an example for others !"

ডি. এস. পি. বুঝলেন লোকটার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু চাকরী করেন বলে নিজের মায়ামমতা বিসর্জন দিতে পারেন না, এখানে থাকা আর তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বললেন, "আমায় মাপ করবেন মেজর, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

মেজর আর তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন না, মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো, বললেন "Alright,"

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, টুটুনের ঘরের চালে আগুন ধরেছে। বীণাকে ছেড়ে দিয়ে শেষবারের মত আবেদন জানাতে এগিয়ে এলেন ঠাকুরমা।

"বাবা, তুমি কি মানুষ নও ? একটা কচি শিশুকে তুমি অমনি করে··· না, না, ওদের বলে দাও, আমার বাড়ীঘর সব যাক, শুধু নাতিটাকে নিয়ে আসুক।"

মেজর নির্বিকার ভাবে পাইপ টেনে যেতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় চীৎকার শোনা গেল, "ঠাকমা, ঠাকমা।"

অজয় ছুটে আসছে পাগলের মত। ঠাকুরমা আর বীণা ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার বুকের ওপর।

"টুটুন, আমাদের টুটুন—"

দাঁড়াবার সময় নেই অজয়ের। মুহূর্তে সে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে জ্বলন্ত বাড়ীর মধ্যে দৌড়ে ঢুকে গেল। মেজরের মুখে তেমনি হাসি। ধরেছেন তিনি শিকার, তাঁর হাত এড়িয়ে পালাতে পারে নি অজয় বাঁড়ুজ্জে।

টুটুনের অচেতন দেহ নিয়ে যখন অজয় বেরিয়ে এলো, তখন মেজর বললেন, "অজয়বাবু, You are under arrest—"

বীণা ততক্ষণ টুটুনকে কেড়ে নিয়েছে নিজের কোলে। ঠাকুরমা, শিবানী সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। সেপাইদের সঙ্গে যাবার সময় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অজয় বলে গেল, "বীণা, টুটুন বোধ হয়—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবু একবার ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ো। ডাক্তারবাবুকে শীগগির দেখিয়ো ঠাকমা··"

অজয় চলে যায়। টুটুনের দেহটা বুকে জড়িয়ে ধরে বীণা আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে আসে। দাউ-দাউ করে জ্বলে যায় ঠাকুমার বড় সাধের সংসার।

* * *

দুঃখের রাত্রিরও শেষ হয়—অজয়দের পরিবারেও রাত্রি প্রভাত হল। আশ্রয়হীন ঠাকুরমা, বীণা, টুটুন ও শিবানীকে নিয়ে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। জানলা দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন, তাঁর শ্বশুরের ভিটে কেমনভাবে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। গাঁয়ের লোক এসে আগুন নিভোবার চেষ্টা করছে, তখন আর প্রায় কিছুই অবাশিষ্ট ছিল না—শুধু গোয়ালঘরের চালাটা কোন রকমে দাঁড়িয়ে। পোড়াবাড়ীর একোণে-ওকোণে জ্বলে-ওঠা আগুন থেকে এখনো অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে। নিস্পন্দ হয়ে ঠাকুরমা দেখছেন—অবিরল অশ্রুধারায় তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে, তবু তিনি দেখছেন। পিছনে টুটুনের মৃত দেহ জড়িয়ে ধরে বীণা চীৎকার করে কাঁদছে, "ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয়। তুই জানিস না, শুধু তোর জন্যেই তোর বাবা ধরা দিয়েছে। আমি তার কাছে কি জবাবদিহি দেব—ফিরে আয়, ফিরে আয় বাবা—"

বহুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠাকুরমা—তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছলেন। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তিনি বীণার কাছে এসে দাঁড়ালেন। গান্ধিজীর শেষ নির্দেশ তাঁর কানে ধ্বনিত হয়ে উঠল,

স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা-লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। মুক্তির জন্য কোন মূল্যই বেশী নহে! সাহস অবলম্বন করুন—ভগবান আমাদের সহায়—"

বীণার মাথার উপর একটা হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ঠাকুরমা। মুক্তির জন্য কোন মূল্যই বেশী নয়। দীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখ-চোখ—ভগবান আমাদের সহায়!…

১২

জমিদার-বাড়ীর বড় হলঘরটার একপাশে অজয় দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো পেছনের দিকে হাতকড়া দিয়ে আটকানো। ধরা দেবার পর দু'দিন দু'রাত্রি কেটে গেছে। ওদের গোপন আস্তানার কথা, দলের অন্যান্য ছেলেদের কথা বের করে নেওয়ার জন্য এই দু'দিন দু'রাত ধরে অকথ্য অত্যাচার চলেছে ওর ওপর। শুতে পায়নি, ঘুমোতে পায়নি, খেতে পায়নি। তবু নির্বিকার অজয়। স্বাধীন-ভারতের স্বপ্ন দেখে সে, এইটুকু অত্যাচারে মাথা নোয়াবে?

একটু দূরে মাটিতে মস্ত বড় একটা জাতীয় পতাকা পাতা রয়েছে। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত মেজর ত্রিবেদী পতাকা মাড়িয়ে এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার চুল বিপর্যস্ত, চোখমুখে ক্লান্তির ছায়া, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। এই অল্পবয়সী ছেলেটিকে নিয়ে বড় মুসকিলে পড়েছেন মেজর ত্রিবেদী। ইংরেজ-মনিবের হুকুম মত তাঁর সামরিক জীবনে বহু অত্যাচার করেছেন ত্রিবেদী, বহু শক্ত লোককে দিয়ে দোষ স্বীকার করিয়েছেন। কিন্তু এরকম একটা জবরদস্ত ছেলের পাল্লায় আর কখনো পড়েন নি।

জাতীয় পতাকার ওপর তাঁর পা এক একবার পড়ছে আর অজয়ের বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাত দুটো যদি খোলা থাকত তা হলে ঐ অমানুষটার টুঁটি টিপে ধরত সে। গান্ধিজীর অহিংসার নীতি মানা কঠিন এ অবস্থায়।

পায়চারি করতে করতে নতুন কোন শাস্তির কথা ভাবছিলেন মেজর।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল তাঁর প্রতি পদক্ষেপে শিউরে শিউরে উঠছে অজয়। বুঝতে পারলেন ওর মনের ভাব, আর নতুন শাস্তির মতলবও মাথায় গজিয়ে উঠল। পতাকার ওপর দিকে এবার খুব ভালো করে মাড়িয়ে আস্তে আস্তে অজয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন মেজর। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "দেখেছ ?—যাও হেঁটে এসো।"

মুখ ঘুরিয়ে অজয় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেজর ধমক দিয়ে উঠলেন, "যাও, শুনছ আমার কথা ?" গলার স্বর ক্রমশ চড়তে লাগলো, "Move, I say, move, move—" অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন মেজর, চোখ ছুটো শয়তানিতে জল-জল করতে লাগলো। রাগের চোটে গলার আওয়াজ এবার অস্পষ্ট হয়ে এলো, "যাবে না ?"

স-বুট পায়ের গোড়ালি দিয়ে অজয়ের দু'টো পা জড়িয়ে থেতলে দিতে লাগলেন মেজর। এতবড় যন্ত্রণাও অজয় নীরবে সহ্য করল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হল না।

হতাশ হয়ে পড়লেন মেজর ত্রিবেদী। এই স্বদেশী ছেলেগুলো মানুষ না অন্য কিছু ? কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। চীৎকার করে ডাকলেন, "হাবিলদার, হাবিলদার !"

ছুটে এসে সেলাম করে হাবিলদার দাঁড়াল। মেজর হুকুম দিলেন, "দো আদমী পাকাড়কে ইয়ে শালে কো ইস্ সাণ্ডে পর চালাও।..."

এতক্ষণে কথা বললো অজয়। একটু হেসে মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, "তাতে তো আমার হাঁটা হবে না—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মেজর। এমন অবস্থায়ও ব্যঙ্গ করার স্পর্ধা রাখে এ ছেলে! নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে এলেন অজয়ের দিকে। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বললে ?"

সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে অজয় জবাব দিলো, "বলছিলাম, তাতে তো আমার হাঁটা হবে না—"

অজয়ের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি। অসহ্য হোলো মেজরের। ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "Shut up you cheeky swine."

দুর্বল দেহে আচমকা এই আঘাত অজয় সহ্য করতে পারল না। ছিটকে গিয়ে ঘুরে পড়ল জাতীয় পতাকার উপর। তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করতে মেজর ছুটে এলেন তার কাছে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। এক ধাক্কায় অজয়কে আবার পতাকার উপর ফেলে দিয়ে হাতের বেতটা নাচাতে নাচাতে বললেন, "Spit on it."

মুখ ঘুরিয়ে অজয় তাকালো মেজরের দিকে। অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি তার মুখে। সপাং করে এক ঘা বেত পিঠের ওপর মেরে মেজর চীৎকার করে বললেন, "থুতু—থুতু ফেল। বুঝতে পারছ না? থুতু ফেল।"

নির্বিকার অজয়ের দিকে তাকিয়ে মেজর ক্রমশ পাগলের মত হয়ে ওঠেন। অবিরাম ঘুসি বেত লাথি চলতে থাকে। মেজর বলেন, "সর্বাধিনায়ক! Bloody Dictator!"

ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ে জাতীয় পতাকার উপর। দাঁতে দাঁত ঘষে মেজর বললেন, "I will kill you like this drop by drop."

শেষবারের মত ওঠবার চেষ্টা করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজয়। মেজরের বেত তখনো সমান বেগে ওঠা-নামা করছে।

* * *

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জমিদার-বাড়ীর ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে ছোট একটি ঘরে অসহ্য যন্ত্রণায় অজয় ছটফট করছে। অল্প অল্প করে জ্ঞান ফিরে

আসছে তার। সর্বাঙ্গে ভীষণ ব্যথা, হাত-পা নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। তেষ্টায় জিভ শুকিয়ে উঠেছে। হাতে ভর দিয়ে কোন রকমে অজয় উঠে দরজায় ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগলো।

একটু জল—একটু জল না পেলে বাঁচবে না সে। অনেক চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালো অজয়। দরজার লোহার গরাদে দু'হাতে ধরে বাইরে যে সেপাই [illegible] ক্ষীণকণ্ঠে তাকে ডাকলো, "সেপাইজী—একটু জল দেবে সেপাইজী? [illegible]—"

অজয়ের ডাক শুনে সেপাই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জলের প্রার্থনা শুনে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অজয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে গেলো।

অজয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বসে পড়ল। এক ফোঁটা জলের জন্য এই শয়তানদের কাছে মাথা নীচু করতে হোল—এই ভেবে লজ্জায় ক্ষোভে তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। হয়তো এখুনি আবার মেজরকে ডেকে আনবে। সত্যাগ্রহী কংগ্রেস-সেবক একটু তেষ্টাও সহ্য করতে পারে না, অথচ দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখে! এই নিয়ে হয়তো মেজর পরিহাস করবে। ওপর দিকে মুখ তুলে অজয় প্রার্থনা করলো, "ভগবান, আমায় শক্তি দাও। কেন আমি জল চাইলাম, কেন চাইলাম!"

পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে অজয় অবাক হয়ে দেখলো, সেপাইটি একাই ফিরে এসেছে—হাতে তার এক লোটা জল। দরজার কাছে এসে চুপি চুপি সে বললো, "বাবুজী, জলদী ইধার আও, হাত বাড়ায়কে পি লেও।"

হাতকড়া-বাঁধা হাত দুটো কোন রকমে গরাদের ফাঁক দিয়ে অজয় বের করে দিলে। সেপাই তাড়াতাড়ি জল ঢালতে লাগলো। প্রথম কয়েক ঢোক কোন রকমে গিলে নিয়ে অজয় বললো, "সেপাইজী, থোড়া আস্তে।"

সেপাই বললো, "নেহি বাবুজী, কোই দেখ লেগা তো বড়া মুসকিল হোগা। কেঁউ পা আপকো পানি দেনে কা হুকুম নেহি।"

নিঃশেষে সব জলটুকু পান করে অজয় বললো, "আঃ—বাঁচালে সেপাইজী।

সেপাই চারিদিকে তাকিয়ে বললো, "এক কাম কিজিয়ে—যো পানি ভিতর গিয়া হ্যায়, আপ কাপড়েসে উস্‌কো পুঁছ দিজিয়ে, ইধার ম্যায় পুঁছ দেগা।"

সে তাড়াতাড়ি লোটাটা সরিয়ে রেখে একটুকরো চট নিয়ে এসে জল মুছতে লাগলো। দরজার ওপাশে অজয়ও নিজের কাপড় দিয়ে মুছতে লাগলো। হঠাৎ অজয়ের মাথায় নতুন এক বুদ্ধি এলো। সেপাইয়ের এই সহানুভূতি কোন কাজে লাগানো যায় কি না। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সেপাইজী, জল দেবার হুকুম নেই—তবু তুমি আমাকে জল দিলে কেন?"

সেপাই তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। এদিক-ওদিক আর একবার তাকিয়ে নিয়ে সে জবাব দিলো, দেখিয়ে বাবুজী, ম্যায় নোকরী করতা হুঁ, নেহি তো বাল বাচ্চেকো ক্যায়সে খিলাউঙ্গা? লেকিন ম্যায়ভি তো আদমী হুঁ, ম্যায়ভি স্বরাজ চাতা হুঁ। বিশ্বোয়াস কিজিয়ে আপ, য্যায়সে স্বদেশী বাবুকো ম্যায় দিলসে পেয়ার করতা হুঁ। আগর বাবুজী রুপেয়া কামানেকা হামারা দুশরী কোই উপায় হোতা তো এ্যায়সী নোকরীকো ম্যায় ঠোকর মার দেতা।"

অজয়ের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ওকে দিয়ে কাজ হাসিল হবে। অজয় বললো, "টাকা তোমার খুব দরকার না সেপাইজী?"

"জী হাঁ"—সেপাই জবাব দিল।

গলার স্বর নামিয়ে অজয় বললো, "আমি তোমাকে একশ' টাকা পাইয়ে দেবো সেপাইজী, যদি তুমি একটা কাজ কর—"

অতগুলো টাকার কথায় লুব্ধ হয়ে উঠলো সেপাই। বললো, "ও কেয়া—"

ওর ব্যগ্র ভাব লক্ষ্য করে অজয় আশান্বিত হোলো। তাড়াতাড়ি সে বললো, "আমি একটা চিঠি লিখে দেবো—সেইটে একজনকে পৌঁছে দেবে। আবার তার উত্তর নিয়ে আসবে। আমার চিঠি পেলেই ওরা তোমাকে টাকা দিয়ে দেবে।"

সেপাই বললো, "নেহি বাবুজী, ডর লাগতা হুঁ। কোই পাকড় লেগা তো নোকরী চলা যায়গী।"

সেপাই পিছন ফেরার উদ্যোগ করছে দেখে অজয় ত্রস্তকণ্ঠে বললো, "আমাদের দিক থেকে তোমার কোন ভয় নেই সেপাইজী। দেখছো তো, আমরা মরে যাবো—তবু একটা কথাও মুখ দিয়ে বার করবো না।"

আশ্বস্ত হোলো সেপাই। একটু ভেবে সে বললো, "জী হাঁ, ইয়ে তো দেখ্ রাহা হুঁ। লেকিন বাবুজী আউর এক বাত হ্যায়, ম্যায় তো শুনা হ্যায় কাল আপকো কোর্টমে লে যায়গা, আগর উধারসে আপকো জেলমে ভেজ দে তো—"

বাধা দিয়ে বললে, "—তো কেয়া ?"

"চিঠিকা জবাব লাকর কিস্‌কো দুঁ ?" সেপাই বললো।

একটু ভেবে নিল অজয়। কাল তো তাকে কোর্টে নিয়ে যাবে। তারপর বললো, "ঠিক আছে। তুমি চিঠিটা আজ রাত্রেই নিয়ে যাবে, আবার আজই তার উত্তর নিয়ে এসো।"

রাজী হয়ে গেলো সেপাই, "জী হাঁ, ইয়ে তো হো সেক্‌তা।"

অজয় উল্লসিত হয়ে বললো, "তাহলে সেপাইজী দয়া করে আমায় একটা পেন্সিল আর এক টুকরো কাগজ এনে দাও।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেপাই বাইরে চলে গেলো। আশান্বিত নয়নে অজয় তার গগন-পথের দিকের তাকিয়ে রইলো।

১৩

আদালতে আজ লোক গিস-গিস করছে—এস্. ডি. ও-র এজলাস উকিল-মোক্তারে ভরে গেছে। এ ছাড়া বাইরের দর্শকও যে কত এসেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এরই মধ্যে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত আমাদের পরিচিত কয়েকজনকে দেখা যায়—রশীদ, বিনোদ, সতীশ—অজয়ের সহকর্মীরা। কেউ সেজেছে বুড়ো চাষা, কেউ বা মৌলবী। পুলিশ-মিলিটারীর দৃষ্টি এড়াবার জন্য এদের সাজ-পোষাক বদল করতে হয়েছে।

আদালতে যেমন ভীড় তেমনি গোলমাল। হাকিম সাহেব বার বার হাতুড়ি ঠুকেও গোলমাল থামাতে পারছেন না। থেকে থেকে ছেলেদের মধ্যেরই কেউ পুলিশের চোখের আড়ালে হেঁকে উঠ্‌ছে "মহাত্মা গান্ধি কী জয়!" "স্বাধীন ভারত কী জয়!" আর সমবেত জনসাধারণ সেই সুরে সুর মিলিয়ে চীৎকার করছে।

রুক্ষ চেহারা কিন্তু দৃপ্ত ভঙ্গীতে অজয় তখন আসামীর ডকে দাড়িয়ে বলছে, মিলিটারী-হেপাজত বা জেল-হেপাজত—যেখানে খুসী আপনারা আমাকে পাঠাতে পারেন। আমার কিছু যায় আসে না। আপনি হাকিম—আপনার কাছে শুধু এইটুকু আমি জানতে চাই যে আমরা যুদ্ধ করছি সভ্য বলে পরিচিত এক জাতির সঙ্গে। কাজেই আমি যুদ্ধবন্দী হিসাবে সভ্য সমাজে প্রচলিত ব্যবহার দাবী করতে পারি কি না? বিচারাধীন আসামী—যে দোষী কি নির্দোষ এখনো তার বিচার হয় নি, হাতকড়া দিয়ে বেঁধে তার ওপর অকথ্য নির্যাতন করা পৃথিবীর কোন্ সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে?"

"আদালত-গৃহে একটা সাড়া পড়ে গেল—সকলে উৎসুক হয়ে তাকালো। পরস্পর বলা-বলায় বেশ একটা কলরব শুরু হোল। হাকিম সাহেব তাঁর হাতুড়ী দিয়ে টেবিলের উপর ঠুকতে লাগলেন। কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টর—যিনি তদন্ত সাপেক্ষে আরো সাতদিন মিলিটারী-হেপাজতে অজয়কে রাখার আবেদন করেছেন—লাফিয়ে উঠে বললেন, "ইয়োর অনার, আসামীর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

ঘৃণা ভরে একবার ইন্‌সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে অজয় মুখ ঘুরিয়ে হাকিমের দিকে চেয়ে বললো, "সত্যাগ্রহী কংগ্রেস-সেবক কখনো মিথ্যা বলে না।" ঠোঁটের, কপালের কাটা দাগ, পিঠের বড় বড় কালশিরের দাগ দেখিয়ে সে বললো, "তা ছাড়া, আমার উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য, তার প্রমাণ দেখুন—এই দেখুন—আরো দেখুন—"

দেহের এক একটা স্থান অজয় দেখায়, আর আদালতসুদ্ধ লোক "আহা—" বলে ওঠে। হাকিমও পাছে ঐসব দেখে অজয়কে মিলিটারীর কাছে না দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেন, তাই কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টর তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "ইয়োর অনার, আসামীর হিষ্টিরিয়া ব্যারাম আছে। সেলে থাকতে ওর বারেবারে ফিট হয়। ঐ অবস্থায় সেলের গরাদেয় আছড়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টায় ও নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইয়োর অনার, ঐ চিহ্নগুলি তারই ফলে হয়েছে।"

এত বড় মিথ্যা শুনে অজয় অবাক হয়ে যায়। মুহূর্ত পরে অনুকম্পার হাসি হেসে বলে, "মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে শক্তি, মিথ্যা ছাড়া তার আর কি আশ্রয় হতে পারে?"

একে রাজদ্রোহী—তার ওপর অজয়ের মুখ থেকে যে সব সত্য বের হচ্ছিল, তা হাকিম সাহেবের মনঃপূত হচ্ছিল না। বাদানুবাদ থামিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই আসামীদের বিরুদ্ধে আপনাদের চার্জ কি?"

কোর্ট-ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, "Section [illegible] read with Section 120[illegible]—Conspiracy and Waging War against the King Emperor—আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করেছে, এবং যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।"

আবার মিথ্যা! অজয় ক্ষেপে উঠলো—ইন্‌স্‌পেক্টরকে বাধা দিয়ে জোর গলায় সে বলে উঠলো, "না—আমি বেআইনী ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, লাঠি-বেয়নেট-মেশিনগান দ্বারা চালিত বৈদেশিক রাজসরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র নয়, প্রকাশ্য আন্দোলন করেছি। আর যুদ্ধ-ঘোষণা—হ্যাঁ, করেছি।"

বলতে বলতে অজয় উৎসাহিত হয়ে উঠছে—তার চোখে দীপ্তি, কণ্ঠে অগ্নিময়ী বাণী। সে বললো, "অত্যাচার আর উৎপীড়নের দ্বারা রাজশক্তি গ্রাস করে যারা আমাদের মাতৃভূমি ও তার চল্লিশ কোটি অধিবাসীকে ক্রীতদাস করে রেখেছে—তাদের বিরুদ্ধে, আমরা মহাত্মাজী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস যুদ্ধ করেছি এবং করবো, যতদিন না আমাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতার সঙ্গে এই শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে আমাদের উন্নততর মহত্তর সমাজ-বিধান—স্বরাজ বা কৃষক-মজদুর-প্রজা-রাজপ্রতিষ্ঠিত হয়।"

অজয় চুপ করলো। উত্তেজনায় তার দেহ থর-থর করে কাঁপছে। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালত-ঘর জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়বার উপক্রম হল। অজয়ের সহকর্মীরা "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" "জাতীয় কংগ্রেস কী জয়" "স্বাধীন ভারত কী জয়" প্রভৃতি ধ্বনিতে উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগলো। অন্যান্য সকলে সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে বিরাট কলরবের সৃষ্টি করলো। আদালত-ঘর যেন জনসভায় পরিণত হোল। জনসাধারণের এই বেয়াদপিতে হাকিম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হাতুড়ী ঠক-ঠক করে তিনি তর্জন করে উঠলেন, "গোলমাল যদি

আর একটুও শুনি, তা হলে বাধ্য হবো আদালত থেকে সবাইকে বের করে দিতে। এটা বিচারের স্থান, তামাসার জায়গা নয়।"

ঘুরে দাঁড়ালো অজয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাকিম সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "মাননীয় বিচারপতি মহাশয়, এটা যদি সত্যিই তামাসার জায়গা না হয়ে বিচারের স্থান হয়, তাহলে আমাকে এখানে দাঁড় না করিয়ে—"

চারিপাশের পুলিশ-প্রহরীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে অজয় বলে, "এই এদের দাঁড় করানো উচিত ছিল। পুলিশ আর মিলিটারী শিশু-বৃদ্ধ বহু গ্রামবাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে।"

গলা ধরে আসছে অজয়ের, তবু সে থামবে না, এদের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দেবেই। কণ্ঠস্বর আরও উঁচু করে সে বলে, "মাতৃজাতির ওপর পাশবিক ব্যবহার করে তাদের ধর্ম-ইজ্জত নষ্ট করেছে। যদি সত্যিই এটা ন্যায়বিচারের স্থান হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলবো, নিয়ে আসুন ওদের এখানে। ওদের বিচার আগে হোক্। আমি জানি, এই তামাসার আদালতে ওদের বিচার কোনদিন হবে না। কিন্তু ভগবানের আদালতে, যেখানে কারো রেহাই নেই— সেখানে এদের বিচার হবে। সে বিচার হতে বেশী দিন দেরী নেই।"

তরুণ-বয়সী এই যুবকের ঔদ্ধত্যে হাকিম সাহেব হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। এদের প্রতি কোন রকম মায়া-মমতা প্রকাশ করা তাঁর অন্যায় বলে মনে হোল। আজকের এই ব্যাপারের পর মিলিটারীর হাতে আসামীকে ছেড়ে দেবার অর্থ কি, তা বুঝেও তিনি আরও সাতদিনের জন্য তদন্ত সাপেক্ষে তাদের হাতে তুলে দিলেন।

আদালত ভাঙলো। হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে সেপাইরা আদালত-ঘর থেকে অজয়কে বের করে নিয়ে চললো। বাইরে বেরিয়েই খুব পরিচিত গলায় ছোট একটু কাসির আওয়াজ পেল অজয়—পাশের দিকে তাকিয়ে বুড়ো রশিদকে দেখতে পেল। ঠোঁটের কোণে হাসি এলো

অজয়ের—নিজেও একটু কেসে উত্তর দিল। আর একটু এগিয়ে বিনোদ, তারও একটু পরে সতীশ—সকলের খুক্-খুক্ কাসির শব্দে অজয় বুঝলো, সেপাইর কাছে পাঠানো তার চিঠি সহকর্মীদের হাতে গিয়ে পৌছেচে।

শহর থেকে আলিগ্রাম সাত-আট ক্রোশ হবে। আদালত থেকে বেরিয়ে অজয়কে ট্রাকে উঠিয়ে রওনা হতে পুলিশ-সাব্ইন্সপেক্টরের একটু দেরী হয়ে গেল। তবে রাস্তা ভাল, সময় বেশী লাগবে না··· ট্রাকের মধ্যে অজয় বসে আছে। হাতে হাতকড়া-লাগানো, কোমরদড়ি ঠিক বাঁধা। দুই পাশে দুটো সেপাই সঙ্গীন উচিয়ে পাহারায় আছে। সামনে ড্রাইভারের পাশে সাব-ইন্সপেক্টর বাবু খুসী মনে বিড়ি ফুকছেন্। প্রায় মাঝ-পথে রেলের একটা লেভেল-ক্রসিং। দূর থেকে ড্রাইভার দেখলো গেট বন্ধ। এখন তো ট্রেনের সময় নয়—কলকাতার গাড়ি যাবে, এখনও তার আধঘণ্টা দেরী। গুমটিওয়ালা বেটা গেল কোথায়? আগে ভাগে কাজ শেষ করে কোথায় নিশ্চয় আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। খুব জোরে হর্ন দিতে দিতে ট্রাক এসে দাঁড়ালো গেটের কাছে। অকারণ বাধা পেয়ে সাব-ইন্সপেক্টর বাবুর পুলিসী মেজাজ চড়ে উঠলো। গাড়ী থেকে মুখ বের করে তিনি বিকট স্বরে চীৎকার করতে লাগলেন, "গুমটিওয়ালা, গুমটিওয়ালা, গুমটিওয়ালা—"

একপাল গরু-বাছুর নিয়ে এক বুড়ো গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সাব-ইনেসপেক্টর বাবুর চীৎকার শুনে সে একটু এগিয়ে এসে বলল—"ও এখন খুলবে নি সাহেব, কোলকাতার গাড়ী চলে গেলে তবে খুলবে। আধ ঘণ্টার উপর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

চোখ পাকিয়ে সাব-ইনসপেক্টর বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কে খুলবে না?"

বুড়ো জবাব দিলো, "ঐ গুমটিওয়ালা। দেখুন না সাহেব, ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে। ডাকলে আবার রাগ করে।"

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু সক্রোধে ট্রাক থেকে নেমে বললেন, ড্রাইভার, গাড়ী বন্ধ করো। এই বুড়ো, চল্ তো—ওর ঘরটা দেখিয়ে দিবি।"

"আসেন বাবু—" বলে বুড়ো প্রায় লাফাতে লাফাতে এগিয়ে পথ দেখিয়ে চললো। সদম্ভে সাব-ইনসপেক্টর বাবু পিছনে চললেন। গুমটিওয়ালার কিন্তু কোন সাড়া নেই, ঘুমুচ্ছে। আজকেই রিপোর্ট করে ওর চাকরীটা শেষ করে দেবেন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু!

গুমটিঘরের দরজা বন্ধ। সাব-ইনসপেক্টর জোরে ধাক্কা দিয়ে খুললেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে চারপায়াটার দিকে এগিযে গেলেন। হঠাৎ পিছন থেকে দু'টী বলিষ্ঠ হাত সাব-ইনসপেক্টরের হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে ফেললো। ফিরে তাকানো বা সাহায্যের জন্য চীৎকার করার আগেই ক্লোরফরম্-ভর্তি একরাশ তুলো কে নাকে চেপে ধরলো। ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার আগেই সাব-ইনসপেক্টর বাবু অজ্ঞান হযে পড়ে গেলেন।

কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে রসিদ বললো, "বিনোদ, চলে আয়। আর তোরা এ বেটাকে ভাল করে কষে বাঁধ।"

* * *

ট্রাকের মধ্যে বসে ব্যাপারটা বুঝতে অজয়ের দেরী হয়নি। ওর চিঠির নির্দেশমত কাজ এগোচ্ছে বলেই মনে হোলো। দু-পাশের সেপাই দুটোর রাইফেলের বাঁটের দিকে অজয় পা ছড়িয়ে বসলো। বাকীটুকু যদি ওরা পারে, তাহলে দু'পায়ে একসঙ্গে লাথি মেরে রাইফেল দুটো ছিটকে ফেলে দিয়ে হাতকড়া-বাঁধা অবস্থাতেই অজয় গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়বে।

রিভলভার হাতে গুঁড়ি মেরে মেরে রসিদ ও বিনোদ ট্রাকের

কাছে এসে পৌছল। অতি সন্তর্পণে একটুও শব্দ না করে পিছনের ডালাটার খিল দুটো খুলে ফেলল। তারপর দু'জনে একসঙ্গে ডালাটা সজোরে নীচে নামিয়ে দিয়ে রিভলভার উঁচিয়ে বলল "হাত উঠাও—" চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অজয় মারল রাইফেলে লাথি। হতভম্ব সেপাই দুটো আস্তে আস্তে মাথার ওপর হাত তুলে বসে রইল। একটা রাইফেল তুলে নিয়ে বিনোদ ছুটলো ড্রাইভারের দিকে।

অজয় ততক্ষণে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে। অজয়ের হাতকড়ার দিকে দেখিয়ে রসিদ বজ্রকণ্ঠে সেপাইদের জিজ্ঞাসা করলো, "চাবী কিস্‌কা পাশ হ্যায়?" একজন সেপাই অত্যন্ত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এসে অজয়ের হাতকড়া খুলতে লাগলো।

রসিদ গুমটিঘরের দিকে ফিরে চীৎকার করলো, "বিরাশী!"

ওদিক থেকে সাড়া এলো "হো—"

রসিদ চেঁচাল, "নিয়ে আয়—"

হাত-পা-মুখ-বাঁধা অবস্থায় সাব-সাব-ইনসপেক্টার বাবুকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এলো কয়েকটি ছেলে। ঐ অবস্থায়ই তাকে ট্রাকে তুলে দেওয়া হোলো।

রিভলভার উঁচিয়ে ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে রসিদ আবার হাঁকলো, "সাত নম্বর, রাস্তা খুলে দে।"

গড়গড় করে রেল-লাইনের দু'পাশের গেট খুলে গেলো। বিনোদ আর রসিদ বন্দুক-রিভলবার উঁচিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম করলে, "চালাও।"

স্বদেশী ডাকাতের হাত থেকে কোনরকমে পরিত্রাণ পেয়ে ড্রাইভার ফুল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে দিলো। মিলিটারী-ব্যারাকে ঢোকার আগে সে আর স্পীড কমাবে না।

অতঃপর ছেলেদের উল্লাসের পালা। অজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের নাচ দেখে কে! একটু পরে রাইফেল দুটো আর রিভলভার রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে সকলে মিলে ছুটলো তাদের গোপন আস্তানার দিকে। গান্ধীজির মন্ত্রশিষ্য তারা—হিংসাত্মক কোন কাজ তারা করবে না, করতে পারে না। তাই কোন আগ্নেয়াস্ত্রেই তাদের প্রয়োজন নেই। নির্ভীকভাবে মরতে তারা শিখেছে, মারতে শেখেনি।

১৪

অজয় পালাবার পর থেকে এই অঞ্চলে কংগ্রেস-কর্মীদের কাজ অত্যন্ত বেড়ে গেলো। এদের সায়েস্তা করবার জন্য মেজর ত্রিবেদী বহু চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারছেন না। উপরওয়ালা সাদা প্রভুদের কাছ থেকে ঘন ঘন জবাবদিহি করার হুকুম আসতে লাগলো,—"But why your methods do not set examples ? Why don't you burn these villages ? Why don't you shoot the offenders at sight ? Why ? Why ?"

বিব্রত হয়ে উঠলেন মেজর। প্রমোশন তো বন্ধ, উল্টে অযোগ্য বলে চাকরী না খোয়াতে হয়!

এদিকে "বিপ্লবী" খবরের-কাগজে আর পোস্টারে গ্রাম-গ্রামান্তর ছেয়ে যাচ্ছে। আকুল আগ্রহে গ্রামবাসীরা পড়তে লাগলো, আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর, মাত্র তিন দিন আর বাকী। ২৯শে তারিখে তোমাদের সব কিছু দেবার জন্য প্রস্তুত হও···"

"আজ ২৭শে সেপ্টেম্বর, মাত্র দুই দিন আর বাকী। 'স্বরাজ না হয় মৃত্যু'—মহাত্মাজীর এই বাণী মাথায় নিয়ে আমরা যেন স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত থাকি···"

এই এক কাজ বাড়লো সেপাইদের। যেখানে পাও, বেশী লোক পড়বার আগেই ওগুলো ছিঁড়ে ফেলো, লুকিয়ে ফেলো।

২৮শে তারিখ ভোরবেলা ছেলের দল সবচেয়ে সাহসের কাজ করলো। ওদের শেষ পোষ্টারখানা মিলিটারী হেড-কোয়ার্টারের দরজায় টাঙিয়ে দিয়ে গেলো।

চাষীদের দুটো ছেলে সবে বানান করে পড়তে শিখেছে, বড় বড় অক্ষরে যেখানে যে লেখা দেখে তাই বানান করে পড়ার চেষ্টা করে। ব্যারাকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো নতুন পোষ্টারখানা। চীৎকার করে দুজনে বিদ্যাচর্চা শুরু করলো, "আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর, একদিন আর বাকী। আগামীকাল বেলা তিনটার সময় প্রথম শোভাযাত্রা বাহির হইবে। সকলে দলে দলে যোগ দিন। ইতি

শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সর্বাধিনায়ক, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি।"

কিন্তু তাদের এই পড়া বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলো না। ব্যারাকের ভেতর থেকে ছুটে এলো এক সেপাই "কোন হায়" বলে; দেখলো, পোষ্টার লাগানো হয়েছে তাদেরই গেটে। রক্ত উঠে গেলো সেপাইর মাথায়, গর্জে উঠলো তার হাতের রাইফেল। পলায়মান ছেলে দু'টির একজন লুটিয়ে পড়লো আর্তনাদ করে। নির্দোষ শিশুর রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো আলিগ্রামের মাটি। বেয়নেটের আগা দিয়ে সেপাই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগলো পোষ্টারটা।

২৮শে সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর অজয়দের মাটির তলাকার গোপন আস্তানায় বীণা গান শেখাতে বসেছে। রসিদ, বিনোদ ও অন্যান্য ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে বসে আছে।

পুত্রশোক বীণাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। সে ভুলে থাকতে পারেনি এইসব ঘরছাড়া নিঃস্বার্থ কর্মীদের—যারা দিনের পর দিন আহার-নিদ্রা ভুলে নিজেদের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দিচ্ছে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—স্বাধীনতা-লাভের

জন্য। যারা দিনের আলোয় বাইরে আসতে পারে না খাবার সংগ্রহ করতে, নিশাচর প্রাণীর মত যাদের সারা রাত সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াতে হয় বিপ্লবের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে, তাদের ভুলে থাকা বীণার পক্ষে অসম্ভব। তাই রাত্রির অন্ধকারে অতি সাবধানে সেপাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে সে খাবার নিয়ে আসে। অজয়কে উদ্ধার করে আনার পর চারিদিকে আরো কড়া পাহারা বসেছে। ছেলের দল উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাত থেকে খাবার নিয়ে খায়। বীণার সামান্য খাবার, এরই জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এই আনন্দ থেকে তাদের কোনদিন বঞ্চিত করেনি বীণা। তাছাড়া দিনান্তে একবার অজয়কেও দেখতে পায় এখানে এসে।

আজও সে এসেছে। টুটুনের মৃত্যুতে সে ভেঙে পড়েনি, কিন্তু আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার। প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণ হাস্যময়ী বীণার মুখে আজ হাসি নেই। রুক্ষ চুল, মুখখানি আগেকার চেয়ে শীর্ণ, চোখের দৃষ্টি শান্ত সমাহিত, যেন ঝড়ের পর দাঁড়িয়ে-থাকা একটি গাছ, ভেঙে পড়েনি—কিন্তু সবুজ পাতা ঝরে গেছে। এ ক'দিনে যেন তার বয়স বেড়ে গেছে অনেকখানি।

ময়নার মৃত্যুর পর এখানে বসেই বীণা সেদিন যখন বলে উঠেছিল, "ময়না-দির জায়গায় না হয় আমি এলাম—" অজয় তাকিয়েছিল তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। কিন্তু আজ বীণার সম্পর্কে আর কিছুই অবিশ্বাস্য নেই। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি বীণার মুখে আজ দৃঢ়তার ছাপ, চোখে কঠোর সংকল্পের গভীরতা, প্রতি পদক্ষেপে আত্মনির্ভরতার পরিচয়। কোন শক্তি আজ তাকে তার আদর্শ থেকে টলাতে পারবে না।

বীণা সেদিন বলেছিল, তার দল গান গেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। সবাইকে গান শেখাবার প্রতিশ্রুতিও সে দিয়েছিল। সে প্রতিশ্রুতি সে রেখেছে।

আজও সবাইকে নিয়ে বসেছে। শেষবারের মত গানটির মহড়া দিতে।

নিস্তব্ধ গুহাঘর। বাইরে যাবার সুড়ঙ্গপথে একটামাত্র মশাল জ্বলছে। মশালের আলো ঘরের সবটা আলোকিত করতে পারেনি। আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে সমস্ত ঘরে একটা রহস্যময় থমথমে ভাব। পাষাণমূর্তির মত নিস্পন্দ বীণা একদৃষ্টে চেয়ে আছে জ্বলন্ত মশালের কম্পমান শিখার দিকে। তার মুখের ওপর দিয়ে বয়ে যায় আলোর কাঁপন। নিস্পলক চোখের সামনে হয়তো ভেসে ওঠে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য—গৃহদাহের লেলিহান শিখার নীচে অসহায় টুটুন। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায় বীণা, কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে গানের শেষ লাইন ক'টা, তার প্রতি রক্তবিন্দু নিঙড়ে যেন উৎসারিত হয় সুর, তার সমস্ত স্নায়ু-শিরা-উপশিরা যেন যোগ দেয় সেই সুরে—

“সংশয় আর নয়

মৃত্যুর পথে আনো হে যাত্রী

মৃত্যুর পরাজয়।

সব রক্ত-শিরায় মহাকাল নিক ভয়াবহ রূপ তার—”

সকলে গাইতে শুরু করে বীণার সঙ্গে। সমবেত স্বরে গমগম করে ওঠে সমস্ত ঘর।. পাশের গুহায় কর্মব্যস্ত অজয়কে আনমনা করে তোলে।

গান শেষ করে বীণা বললো, “ঠিকই আছে। আর দু-একবার তোমরা গেয়ে নিও, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে।”

এই বলে সে বোরখা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়লো এককোণে জড়ো করে রাখা নিশানগুলোর ওপর। “বাঃ, নিশান সব তৈরী হয়ে গেছে দেখছি—” বলতে বলতে সে এগিয়ে গিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর বললো, “তা হলে আজ চলি, কাল সকলের সঙ্গে আবার দেখা হবে।”

"হাঁ, কাল তো আমরা বাজারে একসঙ্গে মিলবো তিনটার সময়—" বললো বিনোদ।

রসিদ বলে উঠলো, "না বৌদি, কাল আপনি বাড়ী থাকবেন। আমাদের লোক যাবে সাড়ে-তিনটায়।"

বীণা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল পাশের গুহার দিকে। অন্য সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে যেতে লাগলো। আজ রাত্রির মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে, আর সময় নেই।

কালকে সেই চরম দিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর।

* * *

পাশের স্বল্পপরিশর গুহাঘরটির মধ্যে একটা চাটায়ে বসে অজয় লিখছে, তার চারপাশে ছড়ান কাগজপত্র। একটা কাঠের টুকরোর উপর বসানো মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের একপাশে দু'জন ছেলে সাইক্লোষ্টাইল-মেসিনে ইস্তাহার ছেপে চলেছে। বীণা এসে ঘরে ঢুকলো। কেউ তার দিকে তাকালো না—যে যার কাজে ব্যস্ত। বীণা আস্তে আস্তে এসে অজয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ময়লা পোষাক, অযত্নবিন্যস্ত চুল, খোঁচা-খোঁচা একমুখ দাড়ি নিয়ে অজয় একমনে লিখে যাচ্ছে। বীণার উপস্থিতি টের পায়নি সে। আদর্শবাদী অজয়—পুত্রের মৃত্যু, গৃহদাহ, মিলিটারীর অকথ্য অত্যাচার কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি। অত্যাচারের চিহ্ন কপালের ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে বীণার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বীণা অপলক চোখে স্বামীকে দেখছে। সাইক্লোষ্টাইল-মেসিন একঘেয়ে আওয়াজ করে চলেছে।

একটু পরে বীণা মৃদুকণ্ঠে বললো, "সর্বাধিনায়ক, এবার আমি যাই।"

অজয় মুখ তুলে তাকালো বীণার দিকে একবার। তারপর লিখতে লিখতেই বললো, "একটু দাঁড়াও লক্ষীটি।"

"বসি তাহলে একটু—" স্মিতমুখে বলল বীণা।

ব্যস্ত হয়ে অজয় একটা প্যাকিং-বাক্সের উপরকার জঞ্জাল সরাতে সরাতে বললো, "হ্যাঁ বোসো, এখানেই বোসো—"

বীণা বসল। অজয় লিখতে লিখতে বলল "দেখ বীণা, তোমাকে কয়েকটা চিঠি দেব।"

লেখা শেষ করল অজয়।

"ব্যস্, হয়ে গেছে। শোনো বীণা, এই চিঠি ক'টা তুমি নিয়ে যাও—এইটে দেবে ঠাকুরমাকে, আর—"

একটা চিঠি দিল সে বীণার হাতে।

বীণা বললো, "ঠাকুরমা তোমাকে একবারটি দেখতে চেয়েছেন।"

চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে রইল অজয়। ঠাকুরমার কথা মনে করে তার বুক ব্যথায় ভরে উঠলো দেশের জন্য তিনি তাঁর ছেলে হারিয়েছেন। চোখের সামনে টুটুনকেও বলি দিতে হোলো। অজয় বর্তমান থেকেও না থাকার মধ্যে, একটু চোখের দেখাও তিনি দেখতে পান না। কত আর মূল্য তাঁকে দিতে হবে?

মুখ তুলে অজয় ভারী গলায় বললো, "আমারও কি ঠাকুরমাকে দেখতে কম ইচ্ছে করে বীণা?" তার চোখে জল ভরে উঠলো। একটু থেমে বললো, "কিন্তু উপায় নেই। কোন উপায় নেই। জান তো, কত কাণ্ড করে এরা আমাকে ছাড়িয়ে এনেছে। যদি আবার ধরা পড়ি এই শেষ সময়ে—তা হলে মুখ দেখাব কি করে?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীণা আস্তে আস্তে বললো, "ঠিকই তো, তোমার ধরা পড়লে চলবে কেন?"

বীণার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে অজয় ধরা গলায় বললো, "তুমি ঠাকুরমাকে আমার কথা বোলো বীণা—"

বীণা সজলচোখে মাথা নাড়ল। দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল।

একটু পরে বীণার হাতে আর একটা চিঠি দিয়ে অজয় বলতে লাগলো, "হ্যাঁ—আর এইটে দেবে রতনপুরের হরিশ ঠাকুরকে। কাল খুব ভোরে আসবে।"

"আর এইটে তোমার কাছে রেখে দেবে—রাত সাড়ে ন'টা দশটা নাগাদ এক ভিখিরী যাবে রাস্তা দিয়ে—কাঁদতে কাঁদতেই যাবে—তাকে ডেকে আগে চাট্টি খাইয়ে দেবে, আর এই চিঠিটা দেবে।"

অজয় শেষ চিঠিটা বীণার হাতে গুঁজে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "সিরাজ, ক'টা বেজেছে দেখ তো?"

ইস্তাহার ছাপায় ব্যস্ত সিরাজ মুখ না তুলেই জবাব দিল, "সাড়ে-আটটা।"

বীণার দিকে তাকিয়ে অজয় বললে "চলো বীণা, তোমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

দু'জনে দরজার দিকে গেল।

* * *

বাইবে যাবার সুড়ঙ্গপথের সামনে এসে অজয় বীণাকে জিজ্ঞাসা করলো, "চিঠিগুলো সাবধানে রেখেছো তো বীণা?"

বীণা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

অজয় তখন চেঁচিয়ে ডাকলো—"রসিদ, রসিদ,—"

পাহারারত একটি ছেলে জবাব দিলো, "ওরা বাইরে গেছে—এখুনি আসবে।"

অজয় বললো, "বীণা এখন যাবে। খালধারটা তুমি একবার দেখে এসো তো ভাই।"

বীণা এতক্ষণ অজয়ের দিকে তাকিয়েছিল, প্রাণ ভরে তাকে দেখছিল। হয়তো আজই শেষ! কাল ২৯শে সেপ্টেম্বর—কার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না।

অজয় তার দিকে ফিরে তাকাতেই বীণা প্রশ্ন করলো, "তুমি এখুনি বেরিয়ে যাবে—না?"

বীণার গলা কাঁপছে।

অজয় উদাস স্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, এই ওরা এলেই—"

বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সহজভাবে সে বীণার কাঁধে একটা হাত রেখে চলতে শুরু করলো। স্বাভাবিক গলায় বলে যেতে লাগলো, "জান বীণা, আজ রাত্রেই আমাদের এ এলাকায় যত রেল-লাইন, পোল, রাস্তা, টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের তার—সব কিছু ভেঙে চুরে নষ্ট করে দেওয়া হবে। ভেবে দেখ বীণা, কাল থেকেই আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নরনারী—যদি আমরা জিতি..."

"আর যদি হারি?" ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলো বীণা।

দাঁড়িয়ে পড়লো অন্ধকার সুড়ঙ্গর মাঝপথে। অনেক চেষ্টা করেও সে সামলাতে পারছে না। তার কেবলি মনে হচ্ছে, এত কৃচ্ছ্রসাধন এত ত্যাগ—এতেও যদি শেষরক্ষা না হয়!

বীণার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয় বিব্রত বোধ করলো। নিস্পলক চোখে সে তাকিয়ে আছে অজয়ের দিকে। অসহায় চোখ দুটো যেন অবলম্বন খুঁজছে। গলা ঝেড়ে যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে অজয় উত্তর দিল, "ক্ষতি নেই—আমাদের মৃত্যু দিয়ে স্বাধীনতার পথ খানিকটা নিশ্চয় এগিয়ে দেব। সেটা সম্পূর্ণ করবে আমাদের পরবর্তী কর্মীরা এসে।"

বীণা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে উচ্চারণ করলো, "হ্যাঁ—"

আর কিছু সে বলতে পারছে না, তার চোখ জলে ভরে এলো। মুখ নীচু করে মাটির দিকে তাকালো বীণা, প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে নিজেকে সংযত

রাখতে। তার বুকের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। টুটুনকে হারিয়েছে, হয়তো অজয়কেও হারাতে হবে। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

"ওগো কাল আমরা আমাদের টুটুনের কাছে যাবো"—বলতে বলতে কান্নায় সে ভেঙে পড়লো অজয়ের বুকে।

অজয়ের মুখ দিয়ে সান্ত্বনার ভাষা এলো না। তার গলায় যেন কি আটকে গেছে। বীণাকে জড়িয়ে ধরে সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলো ধীরে ধীরে।

বীণা উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুলে ফুলে কাঁদছে "টুটুন, আমার টুটুন···"

কিছুক্ষণ পরে অজয় নিজেকে সামলে ধরা গলায় বললো, বীণা, চল এবার লক্ষ্মীটি। রাত হয়ে যাবে।"

বীণা একটু শান্ত হয়ে অজয়ের বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালো। তারপর বললো, "আমাদের হয়তো এই শেষ দেখা, কি বল।"

নীচু হয়ে সে অজয়ের পায়ের ধূলো নিলো। অজয় দু'হাতে তাকে ধরে তুলে ব্যস্তভাবে বললো, "আরে, ও কি করছো ?"

করুণ হাসি হেসে বীণা উত্তর দিল, "জানই তো, বড্ড সেকেলে আমি···"

অজয়ের মনে পড়লো, সে নিজেই সেদিন ময়না-দির প্রসঙ্গে বীণাকে বলেছিল সেকেলে। গভীর স্নেহে সে বীণাকে আবার টেনে নিলো বুকের মধ্যে। ভিজে গলায় বললো, "শুধু সেকালের নও বীণা, তুমি আগামী কালেরও।"

আবেগভরে অজয় বীণাকে বুকে চেপে ধরলো। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বীণা নিজেকে বিলিয়ে দিলো অজয়ের বাহুবন্ধনে। এ আশ্রয় ছেড়ে যেতে হবে—সেকথা ভুলে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

তাদের সচেতন করে দিলো বাইরে থেকে একটা ডাক—"এক নম্বর!"

রসিদ ডাকছে অজয়কে। অজয় উত্তর দিল, "হো—"

বীণাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো অজয়, তারপর চেঁচিয়ে বললো, "ভাই রসিদ, কাউকে দিয়ে তুমি ওকে একটু বাজার পর্যন্ত এগিয়ে দাও।"

সুড়ঙ্গ-মুখে মাথা বাড়িয়ে রসিদ ডাকলো, "আসুন বৌদি।"

বীণার পিঠে একটা হাত রেখে অজয় বললো, "যাও বীণা—"

চোখ তুলে তাকালো বীণা। অজয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নীরব ভাষায় তাকে বিদায় অভিনন্দন জানালো। তারপর আস্তে আস্তে বাইরের দিকে এগিয়ে গেল।

অজয় এগোলো না—দাঁড়িয়ে থেকেই প্রশ্ন করলো, "চিঠিগুলো ?"

বীণা চলতে চলতে উত্তর দিল, "ঠিক আছে।"

অজয় আবার জিজ্ঞেস করলো, "কাল কোথায় থাকতে হবে, তোমাকে বলে দিয়েছে ?"

বীণা জবাব দিলো "হ্যাঁ—"

ততক্ষণে বীণা সুড়ঙ্গের বাইরে গিয়ে পৌঁছেছে।

অজয় চেঁচিয়ে বললো ভিতর থেকে, "এই একটা রাত খুব সাবধানে থেকো কিন্তু—"

একটু ফিরে দাঁড়ালো বীণা। অজয়ের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ। তুমিও—"

বোরখা গায়ে দিতে দিতে বীণা রসিদের সঙ্গে চলল বনপথ ধরে।

অজয় তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে নির্জন সুড়ঙ্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে রসিদ ও বীণা অন্ধকার বনের আড়ালে অদৃশ্য হলো।

* * *

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কিছুদূর যেতেই দলের আর একটি ছেলে পেয়ে রসিদ বীণার সঙ্গে তাকে যেতে বলে আস্তানায় ফিরে গেল। বীণা

চলল ছেলেটির সঙ্গে। অন্ধকার রাত্রির মেঠো রাস্তা জংলা পথ ধরে, ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে, সাপ ও সেপাইর দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে চলেছে তারা। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর তারা বাজারের কাছাকাছি এসে পৌছল। বাজারের আলো দেখতে পেয়ে বীণা সঙ্গের ছেলেটিকে বললো, "আপনার আর আসবার দরকার হবে না, আমি একাই যেতে পারবো।"

বোরখার মুখের ঢাকনা ফেলে দিয়ে বীণা বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার তাকে চলতে হবে লোকজনের মধ্য দিয়ে, সঙ্গে কারো থাকার প্রয়োজন নেই। বাজারের কোলাহলপূর্ণ রাস্তা ধরে যেতে লাগলো বীণা একা। খানিকটা গিয়ে বুটের আওয়াজে ফিরে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, কয়েকজন সেপাই দূর থেকে এগিয়ে আসছে। সে চট করে ডানদিকে দু'টো দোকান-ঘরের মাঝখানে সরু গলিতে ঢুকে পড়লো। দ্রুতপায়ে গলিটুকু পেরিয়ে আর একটা রাস্তায় পড়ে সে একটু হাঁপ ছাড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুটের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো, যে সেপাইরা সেই গলির মধ্যেও ঢুকে পড়েছে। আর সন্দেহ রইলো না যে সেপাইরা অনুসরণ করছে তাকেই। এবার সে ছুটতে আরম্ভ করলো। বাঁকটার আড়ালে যেতে পারলে হয়তো কোন সুযোগ হতে পারে সেপাইদের ফাঁকি দেবার। কিন্তু বাঁকের মুখে পৌছে সে চমকে দেখলো, সেদিক থেকেও কতকগুলো সেপাই ছুটে আসছে। অসহায়ের মত সে কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করলো একবার। কিন্তু পেছনের সেপাইরা তখন কাছে এসে পড়েছে। সেপাইদের মুখোমুখী সে থমকে দাঁড়ালো। উল্টোদিক থেকেও তখন সেপাইরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বীণা বুঝতে পারলো, নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা বৃথা। নিশ্চল হয়ে পড়লো সে। একজন লেফটেনাণ্ট তার দিকে এগিয়ে এসে এক টান মেরে বোরখার মুখের ঢাকনা তুলতেই দেখতে পেলো,

কি যেন সে চট করে মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ করেছে। চেঁচিয়ে উঠলো লেফটেনাণ্ট—"ওগুলো কি মুখে দিলেন? বের করুন, চিবোবেন না—কি ওগুলো, বের করুন…"

বীণা তখন প্রাণপণ চেষ্টা করছে চিঠিগুলো গিলে ফেলবার। কথা বলতে পারছে না, মুখ থেকে টস-টস করে ঘাম ঝরছে। চোখদুটো তার লাল হয়ে উঠেছে। হাতের ইসারায় লেফটেনাণ্টকে যেন সে একটু অপেক্ষা করতে বললো।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো লেফটেনাণ্ট, কি করবে সে বুঝতে পারছে না। পুরুষ হলে গলা চেপে ধরতে দ্বিধা করতো না এক মুহূর্তও। চেঁচিয়ে উঠলো সে আবার, "শীগগির বের করুন বলছি, গিলবেন না—"

ততক্ষণে সবগুলো গিলে ফেলে বীণা নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে বললো, "আপনারা ওগুলো এখনও পেতে পারেন। একটু কষ্ট করতে হবে—ছুরি নিয়ে পেট কেটে বের করে নিতে হবে।"

লেফটেনাণ্ট সাহেব ও সেপাইরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো বেকুবের মত।

বীণা আবার বলে উঠলো, "কই, তাড়াতাড়ি করুন। না হলে লেখাগুলো মিলিয়ে যাবে, আপনারা পড়তে পারবেন না। ঠকে যাবেন—"

হাঁপাতে লাগলো বীণা।

লেফটেনাণ্ট রাগে লাল হয়ে হুকুম দিলো, "হাবিলদার, ট্রাকমে লে চলো।"

একটু দূরে একটা মিলিটারী-ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। সেপাইরা বীণাকে ঘিরে সেইদিকে এগোতে লাগলো।

যে ছেলেটি বীণাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল, বীণা বাজারে ঢোকার পর সে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু বুটের আওয়াজ শুনে সে থেমে গেল। আড়াল থেকে

[illegible] [illegible]রটা রেখে সে ছুটলো বনবাদাড় ভেঙে আস্তানার দিকে অজয়কে খবর দিতে।

মিলিটারী হেড-কোয়ার্টারের হল-ঘরের মধ্যে দ্রুত পাদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেজর ত্রিবেদী! ঠোঁটের কোণে চাপা পাইপের মুখ দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বের হচ্ছে—চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে পৈশাচিক আত্মতৃপ্তি। এত দিনে তিনি বোধ হয় পারবেন ঐ অজয় ছোকরাকে সায়েস্তা করতে! সে-ই তো এ অঞ্চলের বিদ্রোহের আসল উৎস। তাকে জব্দ করতে পারলে জব্দ হবে অন্য ছেলের দল, বন্ধ হবে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র।

নাঃ—মণ্ডল মহাজনের সত্যিই কৃতিত্ব আছে. গাঁয়ের সকলের সন্দেহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে প্রত্যেকবার সে খাঁটী খবর এনে দিচ্ছে। মিটিং-এর খবর, ছোরা তৈরী করতো যে লোকটা তার খোঁজ, অজয়কে ধরবার সুযোগ—সে-ই করে দিয়েছিল। আর আজকের এই খবর, অজয়ের স্ত্রীকে ধরবার কৌশল, তার গতিবিধির হিসাব, সবই সে দিয়েছে। যদি তাঁর লোকজন আজ তাকে ধরতে পারে, তা হলে অজয়দের আড্ডার খবর একটা ভদ্রঘরের মেয়ের কাছ থেকে বের করে নেওয়া শক্ত হবে না। তারপর একসঙ্গে ছোঁড়াগুলোকে ধরে ফেলবেন; মেজর প্রোমোশনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। আর ভাবতে লাগলেন, কোন্ কনট্রাক্টটা দিলে মণ্ডলকে উপযুক্ত পুরস্কৃত করা হবে।

বাইরে শান্ত্রীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মেজর পাইপে একটা জোর টান দিয়ে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। প্রথমে লেফটেনান্ট সেন এবং তার পিছনে সেপাই বেষ্টিত অবস্থায় বীণা এসে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো বীণা, এক মুহূর্ত তার বুকটা কেঁপে উঠলো। কিন্তু

পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে এলো মেজরের টেবিলের দিকে।

স্থির দৃষ্টিতে মেজর তাকিয়ে ছিলেন বীণার দিকে। ঘরে ঢুকে ওর ইতস্তত ভাবটাও তাঁর লক্ষ্য এড়ায়নি। টেবিলের ধারে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মেজর, তারপর আস্তে আস্তে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন।

বীণা একদৃষ্টে মেজরের চোখের দিকে চেয়ে আছে। চোখে তার জ্বালা—টুটুনের মৃত্যুর জ্বালা, শ্বশুরের ভিটে ভস্মীভূত হওয়ার জ্বালা, অজয়ের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের জ্বালা।

আপাদমস্তক বীণাকে একবার দেখে নিলেন মেজর। তারপর কবলিত শিকার নিয়ে হিংস্র পশুরা যেমন খেলা করে তেমনি ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে বললেন, "বোরখা-প্রথাটার যত দোষই থাক, আপনাদের কাজের সুবিধার জন্য অন্তত প্রথাটা বজায় রাখা উচিত, কি বলেন?"

কণ্ঠস্বর কড়া করে মেজর লেফটেনান্টকে হুকুম করলেন, "Remove that, remove that"—

হুকুম পালন করবার জন্য লেফটেনান্ট ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে আসছিলেন। বীণা এক ধমকে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই বোরখাটা খুলে তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিল। লেফটেনান্ট একবার মেজর সাহেবের দিকে তাকালেন, তারপর তাঁর চোখের ইঙ্গিত পেয়ে সৈন্যদের নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বীণা বুঝলো এইবার আসছে তার চরম পরীক্ষা। মৃত্যুকে সে ভয় করে না। যে শয়তান তার টুটুনকে কেড়ে নিয়েছে, তার সমস্ত জীবনের উপর অভিশাপ টেনে এনেছে, আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে দু'কথা শোনাবার সুযোগ সে পেয়েছে—অকারণ ভয় পেয়ে সেই সুযোগ নষ্ট করবে না। খাড়া হয়ে দাঁড়ালো সে।

বীভৎস শয়তানীতে মেজর সাহেবের মুখ ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে। শেষ সিপাইটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর তিনি বীণার দিকে মুখ ফেরালেন। এই সামান্ত গাঁয়ের মেয়েটার সঙ্গে আগেও তাঁর বোঝাপড়া হয়েছিল, কিন্তু সেবারে তাঁকে সে হারিয়ে দিয়েছিল। রুগ্ন ছেলেকে ঘরের মধ্যে রেখে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েও একটা খবর তিনি বের কোরতে পারেন নি। আজও তার দৃপ্তভঙ্গীতে মেজর এটা বেশ উপলব্ধি করছেন, সহজে একে বাগ মানানো যাবে না, এর মুখ থেকে সহজে কথা বের হবে না। ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত ওকে ইতস্তত করতে দেখেছিলেন—সেই কথা মেজরের মনে পড়লো। তিনি বুঝলেন, যে কারণে ওর ঐ ইতস্তত ভাব, সেই থেকেই হয়তো কিছু খবর পাওয়া যাবে। এ জাতের মেয়েদের কাছে প্রাণের চেয়ে সতীত্বের দাম অনেক বেশী।

প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে বীণার দিকে এগিয়ে এলেন মেজর, তাঁর মুখে ফুটে উঠলো শয়তানী হাসি। প্রশ্ন করলেন, "আমায় চিনতে পারছেন?"

মেজরের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বীণা পাল্টা প্রশ্ন করলো "আপনার কি মনে হয়?"

বীণার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করতে করতে হাসিমুখে মেজর আবার বললেন, "কে আমি বলুন তো?"

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো বীণা, "অন্ত কেউ হলে আপনাকে কি বলতো জানি না, হয়তো বলতো—জানোয়ার, শয়তান—এইসব। কিন্তু আমি তাদের চেয়ে অনেক মিষ্টি করে বলবো—আপনি একটি লেজ-কাটা দেশি বাঁদর।"

বীণার চোখে মুখে ফুটে উঠলো অপরিসীম ঘৃণা।

"Really?"—হেসে উঠলেন মেজর, আপনার গালাগালিও যে এত

শুধু, তা যে সেদিন বুঝতে পারি নি।" একটু থেমে লালসা গদগদ গলায় বললেন মেজর, "সত্যি কি মিষ্টি মুখ তোমার!"

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে বীণার চিবুক স্পর্শ করলেন।

"চোপ রও জানোয়ার—" তীক্ষকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো বীণা, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় মেজরের হাতটা সরিয়ে দিলো সে। রাগে ও অপমানে ফুলতে লাগলো বীণা পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘিনীর মত।

মেজর সশব্দে হেসে উঠলেন। যে মেয়েকে অন্য কিছুতে জব্দ করা যায় নি, শালীনতায় সামান্য আঘাত দিয়ে তাকে তিনি চটাতে পেরেছেন। এই তাঁর জয়। এই পথে আর একটু এগোলে ওর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা যাবে।

টেনে টেনে বিশ্রী শয়তানের ভঙ্গীতে হাসতে লাগলেন মেজর।

* * *

বীণাকে বিদায় দিয়ে অজয় এসে বসলো তার কাজে। অনেক কাজ বাকী, এই রাত্রির মধ্যে শেষ করতে হবে। কাল ২৯শে সেপ্টেম্বর।

কিন্তু একি! অজয় কিছুতে কাজে মন দিতে পারছে না। একটা অস্বস্তি বার বার তাকে আনমনা করে দিচ্ছে। নাঃ, বীণা যাবার সময় তার মনটাকে বড় দুর্বল করে দিয়ে গেলো। তার কেবলই মনে পড়ছে—আগুনের কবলে টুটুনের ফ্যাকাশে মুখখানা। তার চোখে ভাসতে লাগলো—জ্বলন্ত ঘরের বাইরে অসহায় ঠাকুরমা, হতভম্ব শিবাণী,—আলুথালু বেশে জলভরা চোখে ছটফট করছে বীণা।

সাইক্লোষ্টাইল মেসিনের ঘড়-ঘড় শব্দে অজয়ের বুকের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেল। সেই ঝড়ের বেগে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তার অতি প্রিয় মুখগুলি। চমকে মুখ ফেরালো অজয়; সিরাজ ইস্তাহার ছাপছে।

না, এ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসলো অজয়। বললো, "সিরাজ, ওদের সবাইকে ডাক তো।"

সিরাজ বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই বিনোদ, রসিদ ও আর কয়েকজন কর্মী ঘরে ঢুকে অজয়কে ঘিরে বসলো।

অজয় তাদের আর একবার শুনিয়ে দিলো গান্ধীজীর শেষ বাণী—"মুক্তির জন্ম কোন মূল্যই বেশী নহে। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া আপনারা অগ্রসর হউন। ভগবান আমাদের সহায়। এই সংগ্রামই কংগ্রেসের শেষ সংগ্রাম। হয় সাফল্য না হয় মৃত্যু। করেঙ্গে—"

সমবেত কণ্ঠে সবাই উচ্চারণ করলো, "—ইয়া মরেঙ্গে।"

সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে অজয় গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করলো, "আর দেরী করলে চলবে না, এবার বেরিয়ে পড়তে হয়। কার উপর কি কাজের দায়িত্ব, সব ঠিক আছে তো? রমেন, তুমি তো যাচ্ছ টেলিগ্রাফের তার কাটতে, তোমার লোকজন সব তৈরী?"

মাথা নেড়ে জবাব দিলো রমেন, "হাঁ অজয়দা, সব ঠিক আছে।"

অজয় বললো, "বেশ। ১৭১ নম্বর পোষ্ট থেকে। ১৭১ই তো···কি বল বিনোদ?"

বিনোদের দিকে চোখ ফেরালো অজয়। বিনোদ মাথা নাড়লো।

অজয় বলে চললো, "১৭১ নম্বর থেকে শুরু করে অন্তত আটটা পোষ্ট উপড়ে ফেলা চাই। আর বিনয়, তোমার ওপর ভার রেল-লাইন তুলবার—"

বিনয়ের দিকে চাইলো অজয়।

"আমাদের ষ্টেশনের দু'মাইল উত্তরে আর মাইল তিনেক দক্ষিণে—এই দু'জায়গায় লাইন ওঠাতে হবে। লাইন তুলে একটু দূরে কোথাও জলে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো, কাছাকাছি ফেলে রেখো না।···আচ্ছা, আমাদের গ্রামে ঢুকবার বড় রাস্তায় খালের ওপর যে পোলটা আছে সেটা

নষ্ট করার দায়িত্ব তুমি নিয়েছ, না পরেশ? খুব হুঁসিয়ার কিন্তু, বেশী লোক সঙ্গে নিও।"

এর পর একটু চিন্তিত হয়ে বললো অজয়, "কিন্তু গ্রামে ঢুকবার আর একটা রাস্তা যে আছে পশ্চিম দিক দিয়ে, সেটা কি করে বন্ধ করা যায়?"

একটু ভেবে নিয়ে আজিজের দিকে তাকালা অজয়। বললো, "ঠিক আছে। আজিজ, এ ভারটা তুমি নাও। গ্রাম থেকে আধ মাইল দূরে রাস্তার ডান ধারে একটা পলাশগাছ আছে দেখতে পাবে। সেইটে গোড়া থেকে কেটে রাস্তার ওপর ফেলে দিও। বড় করাত জোগাড় করে নিয়ে যাও, সঙ্গে জন দশেক লোক রাখবে, এদিক-ওদিক আরো কয়েকটা গাছ ফেলতে পারো কিনা দেখো।"

এভাবে সকলকে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বিনোদ ও রসিদের দিকে তাকিয়ে অজয় বললো, "চল, আমরা এবার—"

অজয়ের কথা শেষ না হতেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো সেই ছেলেটি যে বীণাকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে সে বললো, "অজয়-দা, বীণা-দিকে গ্রেপ্তার করেছে মিলিটারী, বাজারের রাস্তায়—"

হাঁপাতে লাগলো ছেলেটি।

বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত বসে রইল সবাই নিশ্চল হয়ে। অজয় এই নিদারুণ খবর শুনলো অবিচলিতভাবে, মুখখানা তার পাথরের মত শক্ত, ভাবলেশহীন। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো সে, সকলের দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চমক ভেঙে রসিদ উঠে পড়লো। সকলকে বললো, "তোমরা যে যার কাজে চলে যাও।" বিনোদের দিকে চেয়ে বলল "বিনোদ, তুই আয়—"

রসিদ ও বিনোদ অজয়কে অনুসরণ করলো।

অন্ধকার পথ ধরে হন হন করে চলেছে অজয়, রসিদ, বিনোদ। কারো মুখে কোন কথা নেই। তাদের লক্ষ্য জমিদার-বাড়ী—অর্থাৎ মিলিটারী হেড-কোয়ার্টার। বীণাকে এতক্ষণে নিশ্চয় সেখানে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পৌছল ঘাঁটির কাছে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সন্তর্পণে দাঁড়ালো কাঁটাতারের বেড়ার ধার ঘেঁষে। গেটে সশস্ত্র প্রহরী। সীমানার ভেতরেও শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সার্চলাইট ফেলছে এদিক-ওদিক।

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অজয় তাকালো জমিদার-বাড়ীর দিকে। প্রত্যেক ঘরে আলো জ্বলছে। এর মধ্যে কোন ঘরে বীণাকে নিয়ে রেখেছে—হয়তো মাঝের হলঘরটায়—তাকেও তো প্রথম ঐ ঘরেই নিয়ে গিয়েছিল জেরা করতে। অজয়ের মনে পড়ে গেলো মেজর ত্রিবেদীর কথা। ঐ অত্যাচারী দানবটার হাতে আজ বীণা একা। রক্ত চড়ে গেলো অজয়ের মাথায়, স্থান-কাল ভুলে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলো ভেতরে ঢুকবার চেষ্টায়। কিন্তু বিনোদ আর রসিদের বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। সেই মুহূর্তে সার্চলাইটের আলো তাদের দিকে আসতে দেখে অজয় কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেলো। সকলে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো, তারপর বুকে হেঁটে খানিকটা দূরে একটা বড় গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো।

অসহায় দৃষ্টিতে চাইলো অজয় আলোকোজ্জ্বল বাড়ীটার দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটছে। অন্ধকার গাছতলায় প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।

মেজরের টেবিলের উপর একটা হাত রেখে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে বীণা। আর মেজর ত্রিবেদী ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে টেবিলের এপাশ থেকে ওপাশ

পায়চারী করছেন, ঘন ঘন পাইপে টান দিচ্ছেন। রাগে ফুলছে তাঁর সমস্ত শরীর। এতক্ষণ হয়ে গেল—তবু একটা কথাও বীণার মুখ থেকে বের করতে পারেন নি। সব প্রশ্নের তীক্ষ্ণ কাটা-কাটা জবাব দিচ্ছে সে আসল উত্তর এড়িয়ে।

এ কোথায় এসে পড়েছেন মেজর, এদেশের লোকগুলো কি রক্তমাংসে গড়া নয়? কোন ভয় এদের নেই, কোন অত্যাচারকে এরা গ্রাহ্য করে না। ময়না, দাশু কামার, অজয়—কারো কাছ থেকে একটা খবরও মেজর বের করতে পারেন নি—অমানুষিক অত্যাচার করেও প্রত্যেকের কাছে হার হয়েছে তাঁর। সুদীর্ঘ চাকুরী-জীবনে এরকম বিপদে তিনি পড়েন নি কখনো। এ মেয়েটাও তাকে বার বার জব্দ করে দিচ্ছে।

নাঃ, এ হতে পারে না। থমকে দাঁড়ালেন মেজর বীণার সামনে। ক্ষিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় অজয়? কোথায় আছে সে?"

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিলো বীণা, "আসবেন। আমাকে ধরে এনেছেন তো? নিশ্চয়ই এক্ষুণি তিনি ছুটে আসবেন। অর্ধাঙ্গিনী যে! বাইরে লোক পাঠান শীগগির—ধরে ফেলতে পারবেন।"

দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন মেজর, "হুঁ! ধরে আমি তাকে ফেলবই। তবে—"

"তবে, মৃত। হ্যাঁ, তা-ও কাল বেলা ৩টার আগে নয়—"

একটু চুপ করে থেকে সহজ সুরে আবার বললো "ধরা তো তিনি দিয়েই ছিলেন, কিন্তু কই—রাখতে তো পারলেন না!"

পাইপটা জোরে কামড়ে ধরে উচ্চারণ করলেন মেজর "মরবে কিনা! তাই পাখা উঠেছে।" বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন, "Where is Ajoy? Where is he?"

শান্ত গলায় বীণা প্রশ্ন করলো, "কাকে জিজ্ঞেস করছেন?"

চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর, "Who else is here?"

হাসিমুখে বীণা বললো, "ও, তাহলে আমাকে ?"

"Yes, yes, yes"—ক্ষেপে উঠেছেন এবার মেজর।

মেজরের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বীণা বলতে লাগলো, "উঃ, কি বোকা! এটুকু বুদ্ধি আপনার মাথায় এলো না—আমার টুটুনকে আগুনে পুড়িয়ে মারা নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তবু একটিবারও বলতে পারলাম না উনি কোথায়, আর এখন তা আপনাকে আমি বলে দেবো ? কেন ? কিসের ভয়ে ? কি ভয় আপনি আমাকে আর দেখাতে পারেন ?"

বীণার চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে তার বুকের জ্বালা, আগুনের মত জ্বলছে চোখদুটো।

দাঁতে দাঁত চেপে কর্কশ কণ্ঠে বললেন মেজর, "You will know that, you will know that. Now speak up and right now···"

বীণা প্রশ্ন করলো, "ও, এক্ষুণি বলতে হবে আমাকে ?"

"Yes···"

আবার জিজ্ঞেস করলো, বীণা, "আর না বললে ? রেহাই নেই—কি বলেন ?"

"Exactly"—মেজর বললেন।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে বীণা বললো, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ইংরেজ তাড়াবার জন্য মিছিমিছি আর কংগ্রেসের আন্দোলন চালাবার দরকার নেই। আপনার মত এ রকম মূর্খ গুটিকতক অফিসার থাকলে এমনিতেই ওদের এখান থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।"

প্রতিটি কথার সঙ্গে শ্লেষউপচে পড়ছে বীণার কণ্ঠ থেকে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মেজর, "আমার সহ্যের একটা সীমা আছে·—"

"বোকামীরও একটা সীমা থাকা উচিত"—মুখের ওপর জবাব দিলো বীণা।

মেজর রাগে কাঁপতে লাগলেন। চোখ দুটো তাঁর লাল হয়ে উঠেছে জবাফুলের মত। কিন্তু নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। কথা কাটাকাটি করে মিছিমিছি সময় নষ্ট হচ্ছে। এ মেয়েকে ঘায়েল করবার ঐ একটি মাত্র উপায়ই আছে, যা তিনি প্রথমে আঁচ করেছিলেন। এবার সোজাসুজি সেই পথে অগ্রসর হবেন।

বুকের উপর হাত দু'খানা ভাঁজ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মেজর। বীণার চোখে চোখ রেখে শান্ত সংযত গলায় প্রশ্ন করলেন, "মহাভারত পড়েছেন ?

হঠাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে ও মেজরের আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো বীণা চিন্তিত মুখে। জবাব দিলো, "একটু একটু—"

মেজর জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের কথা মনে আছে ?"

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো বীণার। বুঝতে পারলো এবার মেজরের ইঙ্গিত। তার চোখে, মুখে নামলো শঙ্কার ছায়া। কোন জবাব আর মুখে এলো না— ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো সে মেজরের মুখের দিকে—

মেজর লক্ষ্য করলেন তার এই সন্ত্রস্ত ভাব। তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো ক্রূর হাসি। টেনে টেনে বললেন, "সেখানে কেষ্ট ঠাকুর এসে দ্রৌপদীর ইজ্জত রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এখানে ? এখানে কে আপনাকে রক্ষা করবে ?"

মেজরের মুখের দিকে আর চেয়ে থাকতে পারলো না বীণা। মাটির দিকে তাকিয়ে সে ঘামতে লাগলো।

পৈশাচিক আনন্দে মেজর, ত্রিবেদীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। এবার তাঁর জয় সুনিশ্চিত। মুখ ফিরিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তিনি, ডাকলেন "লেফটেনান্ট সেন !"

পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন লেফটেনান্ট সেন। স্যালুট করে দাঁড়ালেন। "স্যার"—হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

ভীতা হরিণীর মত করুণ চোখে বীণা লেফটেনান্টের দিকে ও তারপর মেজরের দিকে মুখ তুলে চাইলো। দুই চোখ দিয়ে যেন মিনতি ঝরে পড়ছে।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মেজর। এতক্ষণে জব্দ হয়েছে মেয়েটা। অবিচলিত স্বরে হুকুম করলেন, "Search her person—"

শিউরে উঠলো বীণা। অন্য যে কোন অত্যাচারের জন্য প্রস্তুত ছিল সে, কিন্তু আজ হারাতে বসেছে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। লেফটেনান্ট সেন এগিয়ে আসছেন তার দিকে হাত বাড়িয়ে।…না, এ হতে পারে না। চেঁচিয়ে উঠলো বীণা মিনতির সুরে, "আমার গায়ে হাত দেবেন না! না—না—"

বলতে বলতে সে কয়েক পা পেছিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লেফটেনান্টও অগ্রসর হলেন। বীণা ঘুরে গিয়ে ছুটবার চেষ্টা করতেই লেফটেনান্ট পেছন থেকে তার ব্লাউজের গলার কাছটা চেপে ধরলেন। এক হ্যাঁচকা টানে বীণা ছাড়িয়ে নিলো নিজেকে। ফড়-ফড় করে ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেল কাঁধ থেকে পিঠ অবধি।

"আমাকে ছোঁবেন না, আমাকে ছোঁবেন না—"।

পেছিয়ে যাচ্ছে বীণা, চোখ দিয়ে দর-দর করে জল পড়ছে। লেফটেনান্ট অনুসরণ করছেন তাকে। কিন্তু কতদূর আর পেছোবে বীণা? ঠেকে গেলো দেয়ালের গায়ে। লেফটেনান্ট এসে দাঁড়ালেন তার মুখোমুখি। অশ্রু-বিগলিত কণ্ঠে বীণা কেবলি মিনতি করছে "না—না—না—"

লেফটেনান্ট হাত বাড়ালেন তার দিকে আবার।

বীণার মনে পড়লো—দাশু-খুড়োর দেওয়া ছোরাখানা আছে তার সঙ্গে এখনো। ক্ষণিকের জন্য কঠিন হয়ে উঠলো বীণার চোখ-মুখ। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোমর থেকে ছোরা টেনে নিয়ে আমূল বসিয়ে দিল লেফটেনান্টের বুকে।

আর্তনাদ করে বীণার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন লেফটেনান্ট সেন। বিস্ফারিত চোখে হতভম্ব হয়ে বীণা দাঁড়িয়ে রইলো।

এতক্ষণ স্থির হয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন মেজর। চোখে তাঁর জয়ের আনন্দ, মুখে পিশাচের হাসি। কিন্তু লেফটেনাণ্ট সেন মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন। অবিশ্বাস্য চোখে দেখলেন—মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট-ফট করছেন লেফটেনাণ্ট সেন। উচ্চকণ্ঠে হাঁকলেন মেজর, "হাওলদার, হাওলদার!"

বাইরে থেকে ছুটে এলো হাবিলদার। মেজরের হুকুমে আর এক সেপাইকে ডেকে লেফটেনাণ্টকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো হাসপাতালের দিকে।

মেজর এবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন নিস্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বীণা। দেয়াল ঘেঁষে সে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আহত লেফটেনাণ্টের অপসৃয়মান দেহটার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত মেজর অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রাগে জ্বলছে তাঁর সমস্ত শরীর। খুন! তাঁরই চোখের সামনে তাঁর সহকারীকে খুন করার সাহস করে এই মেয়েটা? কোন ভদ্রতার বাঁধন আর রাখবেন না মেজর। এই একটা মেয়েকে দিয়ে এমন শিক্ষা দেবেন তিনি, যে সমস্ত আলিগ্রাম ভয়ে থর-থর করে কেঁপে উঠবে! এক পা এক পা করে মেজর এগোতে লাগলেন—

হঠাৎ বুটের খট-খট শব্দে চমকে চাইলো বীণা। মেজর ত্রিবেদী দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন তার দিকে। আর নিস্তার নেই। ভয়-ব্যাকুল চোখে চেয়ে রইলো সে। হিংস্র শ্বাপদের মত এগিয়ে আসছেন মেজর তাকে গ্রাস করতে। মুখে তাঁর ক্রুর সংকল্প, চোখে প্রতিহিংসার জ্বালা···আর সেই আদিম প্রবৃত্তি। না, না—বীণা আর সইতে পারছে না ও-দৃষ্টি, দেয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে সে···

কিন্তু, না—বাঁচাবার কোন উপায়ই আর নেই। ভারী বুটের খট-খট আওয়াজ সমস্ত চেতনা ছাপিয়ে বীণাকে যেন চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরছে। শেষবারের

মত প্রাণপণ শক্তিতে ঐ আওয়াজের কাছ থেকে দূরে পালাতে চেষ্টা করলো সে। সাপের মত দু'খানা হাত শুধু এগিয়ে এলো তার দিকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে চীৎকার করে উঠলো বীণা।

মিলিটারী-ঘাটির দিকে লক্ষ্য রেখে সারারাত অন্ধকার গাছতলায় বসে আছে তিন জন—অজয়, রসিদ, বিনোদ। বীণাকে রক্ষা করবার কোন উপায়ই ওদের হাতে নেই, অথচ ফিরে যেতেও পারে নি ওরা। ওদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ, অক্ষমতার গ্লানি।

ভোর হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ২৯শে সেপ্টেম্বরের সূর্যোদয়!

অজয় বসে আছে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। রসিদ, বিনোদ তার পাশে বসে উদাস চোখে এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখছে।

হঠাৎ আবছা আলোয় রসিদের চোখে পড়লো মিলিটারী-গেটের ভেতর থেকে দু-জন সেপাই কি একটা ভারী জিনিষ বয়ে নিয়ে আসছে। অজয় ও বিনোদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলো রসিদ। তিনজন উৎসুক চোখে দেখলো, সেপাই দুটো গেটের বাইরে এসে চারদিকে একবার তাকিয়ে চলতে শুরু করলো রাস্তা ধরে। ওরা আড়ালে থেকে অনুসরণ করলো সেপাইদের। একটু কাছা-কাছি এসে ওরা বুঝতে পারলো—সেপাইরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা মানুষের দেহ। অজয়ের বুক কেঁপে উঠলো।

রাস্তার একটা বাঁক ছাড়িয়ে কিছুদূর এসে সেপাই দুটো পথের ধারে ঝোপজঙ্গল-ভরা একটা খাদের মধ্যে দেহটা ফেলে দিয়ে ফিরে চলে গেল।

সেপাইরা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে আড়াল থেকে তিন জনে বেরিয়ে এল। রাস্তা' দিয়ে ছুটে গেল খাদের ধারে। দেখলো, বীণার নিশ্চল দেহ পড়ে আছে খাদের মধ্যে। ছিন্নভিন্ন তার পোষাক; বোঝা যাচ্ছে না, জীবিত কি মৃত।

খাদে নেমে গেল অজয়। বীণাকে দু-হাতে ধরে মুখের কাছে ঝুঁকে উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকলো, "বীণা বীণা।

প্রাণ আছে কিন্তু চেতনার কোন লক্ষণই নেই। অসহায় চোখে অজয় একবার তাকালো বিনোদ আর রসিদের দিকে। তারপর বীণার অচেতন দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে এগিয়ে চললো কাছাকাছি জলের ধারে। রসিদ ও বিনোদ নীরবে অনুসরণ করল।

জলের ধারে বীণার দেহ নামিয়ে চোখে মুখে অনবরত জলের ঝাপটা দিতে লাগলো তিন জনে। অজয় ব্যাকুল কণ্ঠে মাঝে মাঝে ডাকতে লাগলো, "বীণা, বীণা—"

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইল বীণা। ঝাপসা চোখে সকলকে দেখলো একবার মুখ ঘুরিয়ে। আশান্বিত অজয় উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকলো, "বীণা, বীণা—"

বীণা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। যেন চিনতে পারছে না অজয়কে। বীণার দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অজয় আবার ডাকলো, "বীণা, বীণা—এই যে আমি, বীণা⋯"

ঝাঁকুনি খেয়ে বীণা শিউরে উঠলো। তার মনে হলো, মেজর ত্রিবেদী এখনো তাকে ধরে আছেন। বিভ্রান্ত চোখে অজয়ের দিকে তাকিয়ে "না—না—না—" বলতে বলতে সে উঠে বসলো।

ব্যস্ত হয়ে অজয় বলতে লাগলো, "বীণা, আমায় চিনতে পারছো না?"

হাত বাড়িয়ে অজয় বীণাকে ধরতে গেলো।

বীণার চোখে ভেসে উঠলো সেই মর্মান্তিক দৃশ্য—লেফটেনান্ট সেন সার্চ করতে আসছেন তাকে।

"আমার গায়ে হাত দেবেন না। না, না—" বলতে বলতে দাঁড়িয়ে কয়েক

পা পেছিয়ে গেলো বীণা। এলোমেলো চুল, আলুথালু বেশ, আঁচলটা মাটিতে লুটাচ্ছে—

হতভম্ব অজয় উঠে দাঁড়ালো। বিহ্বলকণ্ঠে বললো. "ও তুমি কি বলছো বীণা? এই যে আমি"—

বিস্ময়াকুল চোখে তাকিয়ে সে বীণাকে অনুসরণ করলো।

"আমাকে ছোঁবেন না, আমাকে ছোঁবেন না"—বীণা পেছিয়ে যেতে লাগলো।

কয়েক পা গিয়েই একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেকে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে পড়লো সে। তার বিস্ফারিত চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। মিনতির সুরে কেবলি বলছে, "না—না—না"

এগিয়ে আসছে অজয়। দু-হাত বাড়িয়ে আকুল স্বরে ডাকছে, "বীণা, বীণা, বীণা—"

বীণার দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠলো মেজর ত্রিবেদীর হিংস্র চেহারা; দু'হাতে মুখ ঢেকে সে চীৎকার করে উঠলো।

বেদনাহত অজয় থমকে দাঁড়ালো।

পরমুহূর্তে বীণা দৌড়ে রাস্তার ওপর গিয়ে উঠলো। তারপর ছুটতে শুরু করলো রাস্তা ধরে মিলিটারী হেড-কোয়ার্টারের দিকে।

বিহ্বল দৃষ্টিতে অজয় চেয়ে রইলো, কিছুক্ষণ তার গতিপথের দিকে। তারপর সচকিত হয়ে সে-ও ছুটলো বীণার পিছনে।

বিনোদ, রসিদ এতক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার তারাও অজয়কে অনুসরণ করলো।

প্রাণপণে ছুটছে বীণা। একবার পেছন ফিরে দেখলো অজয়কে, তারপর রাস্তার বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

অজয় দৌড়ে বাঁকের মুখে পৌছাইতেই পেছন থেকে বিনোদ আর রসিদ তাকে ধরে ফেললো। বাধা দিয়ে রসিদ বললো, "এই অজয়, চলে আয়। আর এগোলে গুলী করবে!"

অজয়কে থামতে হোলো। বাঁক ছাড়িয়ে একটু দূরেই মিলিটারী হেড-কোয়ার্টার গেট দেখা যাচ্ছে।

ততক্ষণে বীণা গেটের কাছে পৌছে ফিরে দাঁড়িয়েছে, দু-হাত বাড়িয়ে অজয়দের উদ্দেশে উন্মাদের মত চীৎকার করছে, এই যে আমি। আমাকে ধরবেন না। আমাকে 'সার্চ' করবেন না—"

বীণা পাগল হয়ে গেছে, এ ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। অজয়, রসিদ, বিনোদ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বীণার দিকে, আর শুনছে তার অসংলগ্ন প্রলাপ।

দু'হাতের বুড়ো আঙুল উঁচু করে বীণা তখনো চেঁচাচ্ছে, "আমাকে ধরবে না কচু! এখানে এলেই অমনি গুড়ুম! আমাকে সার্চ করবেন না আরো-কিছু! গুড়ুম! হাঃ, হাঃ হাঃ—"

উন্মত্ত হাসিতে গড়িয়ে পড়লো সে।

অজয় পথের মাঝে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে চেয়ে অছে। টপ-টপ করে জল পড়ছে দু'চোখ দিয়ে।

টেনে টেনে বিশ্রী খল-খল হাসি হেসে চলেছে উন্মাদিনী বীণা।

২৯শে সেপ্টেম্বর—সকালবেলা।

ঘুম ভেঙে আলিগ্রামবাসী স্তম্ভিত হয়ে শুনলো, বীণা পাগল হয়ে গেছে। সমস্ত গ্রামের উপর নেমে এলো ভয়াবহ বিষাদের ছায়া।

হরি মোড়ল চিন্তিত হয়ে লক্ষ্য করলো গ্রামবাসীরা মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু তা হলে তো চলবে না। আজকের অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে

উৎসাহিত করতে হবে সকলকে। অথচ গ্রামের যুবক কর্মীরা বেশীর ভাগই গা-ঢাকা দিয়ে আছে, প্রকাশ্যে কিছু করবার উপায় তাদের নেই।

হরি মোড়ল নিজেই বেরিয়ে পড়লো গ্রামবাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে। প্রৌঢ় মোড়ল অস্থির পায়ে চলতে লাগলো গ্রামের পথ ধরে।

"শোধ নিতে হবে, এর শোধ নিতে হবে, গুণে গুণে নেবো একটি একটি করে, কাউকে ছাড়বো না—

একটি দু'টি করে লোক বেরিয়ে আসছে হরি মোড়লের পিছন পিছন। হরি মোড়ল তাদের দিকে তাকিয়ে বলে, "শোননি? তোমরা শোননি? বীণা, আমাদের অজয়ের স্ত্রী বীণা—তাকে পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে। শোধ নিতে হবে, শোধ নিতে হবে। ময়না, দাশু, টুটুন, বীণা—

আঙুল গুণতে গুণতে যাচ্ছে মোড়ল।

গলা ছেড়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "আলিগ্রাম! আলিগ্রাম! প্রতিশোধ নেবে একটি একটি করে—গুণে গুণে প্রতিশোধ নেবে। আজ ২৯শে। সবাই বেরিয়ে এসো।

হঠাৎ থেমে গেল হরি মোড়ল। দু'পাশের বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগলো "ঘরের ভেতর থেকে কি শুনছো! বেরিয়ে এসো। যারা তোমাদের বিশ্বাস করে এগিয়ে গেল বিশ্বাসঘাতক হোয়ো না তাদের প্রতি। সবাই বেরিয়ে এসো। এগিয়ে চলি।"

হুড়-হুড় করে লোক জমতে শুরু করলো হরি মোড়লকে ঘিরে। মোড়ল দ্রুতপায়ে অগ্রসর হোলো বাজারের দিকে।

অনর্গল চীৎকার করতে করতে সে বাজারে ঢুকলো। "জান তোমরা, কাল রাত্রে আমাদের ছেলেরা কি করেছে? অসাধ্য সাধন করেছে—রাস্তা-ঘাট, রেল-লাইন, তার ভেঙে ছিঁড়ে চুরমার করে উড়িয়ে দিয়েছে। বন্দুক, বেয়নেট,

মেশিনগান—কিছুই তাদের থামাতে পারে নি। মৃত্যু তাদের পথ-রোধ করতে পারেনি।

"জয়, আলিগ্রামের জয়!"

অনুসরণ-রত জনতা সমস্বরে যোগ দিল জয়ধ্বনিতে।

বাজারের মধ্যে এসে থামলো হরি মোড়ল। সুর বদলে বলতে লাগলো, "কিন্তু এ জয় নিরর্থক, যদি আমরা শেষরক্ষা করতে না পারি—যদি না আজ বিকেলে ঐ মিলিটারী-ঘাটি দখল করতে পারি। পারবো, নিশ্চয় পারবো। নিরস্ত্র, অহিংস জনতার-শক্তি। এই যুদ্ধে মহাত্মাজী তাঁর জীবনের শেষ পরীক্ষা দিচ্ছেন এই আমাদের নিয়ে। তাই—"

হঠাৎ হরি মোড়লের চোখ পড়লো সামনের দোকানের দেয়ালে লাগানো একটা পোষ্টারের দিকে।

"ঐ, ঐ দেখ—অজয় আবার কি লিখেছে! ঐ যে—"

বলতে বলতে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এলো মোড়ল, চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো। জনতা তার সামনে উৎসুক হয়ে শুনছে।

"আজ আমাদের চরম-পরীক্ষার দিন। 'স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু—দৃঢ়চিত্তে এই কঠোর সংকল্প নিয়ে মহাত্মাজীর আহ্বানে আমরা সাড়া দেবো শুধু এক মন্ত্র মুখে নিয়ে—ভারত ছাড়ো ইংরেজ।"

জনতা উদ্বেল হয়ে উঠলো, সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, "ভারত ছাড়ো···"

এরোপ্লেনের শব্দে চকিত হয়ে সকলে তাকালো আকাশের দিকে। দূর থেকে এরোপ্লেন আসছে। তাদের মাথার ওপর পৌছে হঠাৎ চিলের মত যেন ছোঁ মারতে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে একঝাঁক গুলি ছিটকে পড়লো এদিক-ওদিক।

প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালালো। মুহূর্তের মধ্যে জনশূন্য হয়ে পড়লো সমস্ত বাজারটা। হরি মোড়ল আকাশের দিকে তাকিয়ে একা দাঁড়িয়ে রইলো। এরোপ্লেন মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরছে, আর মাঝে মাঝে মেসিনগানের গুলীবর্ষণ করে চলেছে। ২৯শে সেপ্টেম্বরের অহিংস গণবিপ্লব রোধ করতে সরকার এরোপ্লেনে মারণাস্ত্র পাঠিয়েছেন।

এরোপ্লেনের দিকে তাকিয়ে মোড়ল ক্ষ্যাপার মত চেঁচাতে শুরু করলো, "খুব উড়ে বেড়াচ্ছ বাছাধনরা। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে এই শেষবারের মত যাও। কিন্তু জেনে রাখো—এই শেষ। এই আমার কাছ থেকে শুনে যাও—আজ বেলা তিনটার পর আর এ পথ দিয়ে ফিরতে দেবো না। ভারত তোমাদের ছাড়তে হবেই।"

গুলি এসে বিঁধলো হরি মোড়লের বুকে। আহত স্থানটা দু'হাতে চেপে ধরে চীৎকার করে তবু বলে, "স্বাধীন-ভারতের অনুমতি তখন তোমাদের চাইতে হবে। ভারত ছাড়তেই হবে—"

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো প্রৌঢ় হরি মোড়ল। ২৯শে সেপ্টেম্বরে আলিগ্রামের প্রথম বলি!

২৯শে সেপ্টেম্বর—প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে।

জনসাধারণের সব-কিছু দখল করবার প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করতে মেজর ত্রিবেদী কি ব্যবস্থা করছেন, তা পরিদর্শন করবার জন্য উপরওয়ালা দু'তিন জন ইংরেজ-অফিসার এসেছেন। সমারোহের সঙ্গে মেজর ডবল-কাঁটাতারের বেড়া, সৈন্য-সংস্থাপন ইত্যাদি তাঁদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। সর্বশেষে অভ্যাগতদের সম্মানে সৈন্যদলের কুচ্‌কাওয়াজ হোলো। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বন্দুক উপর-নীচু করে সৈন্যরা ইংরেজ প্রভুদের সম্মান জানালো।

মেজরের ব্যবস্থায় অফিসাররা খুশী। নিরস্ত্র জনতাকে মারবার নানা-কৌশলে তাঁদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইলো না। পিঠ চাপড়ে মেজরকে বাহবা দিয়ে সদলবলে তাঁরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় দূরাগত বহু কণ্ঠের সমবেত চীৎকার শুনতে পেলেন, "ইংরেজ—ভারত ছাড়ো!"

চকিত হয়ে সকলে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, বহু জাতীয়-পতাকা উড়িয়ে একদল নরনারী এগিয়ে আসছে মিলিটারী হেড-কোয়ার্টারের দিকে।

ব্যস্ত হয়ে অফিসাররা গেটের কাছে এগিয়ে এলেন। বন্দুক নেই, মেসিন-গান নেই, অস্ত্রের মধ্যে পতাকার দণ্ডগুলি। এদের দুঃসাহস দেখে অফিসারদের বড়কর্তা স্তম্ভিত হয়ে মেজরকে ডেকে বললেন, "Major Trivedi, I hope you will be able to teach these devils a good lesson.

হেড-কোয়ার্টার দখলের এই প্রচেষ্টায় মেজরের হাসি আসছিল। এরই জন্যে তিনি বাড়তি সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন! স্মিতমুখে তিনি জবাব দিলেন, "I hope so, Sir."

ক্যাপ্টেন সিং এবং অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে জনতার গতি রোধ করতে মেজর এগিয়ে গেলেন শোভাযাত্রার দিকে।

* * *

বীণা পাগল হয়ে গেছে। তাই যে শোভাযাত্রিদলের নেতৃত্ব করার কথা তার ছিল, সে দলের ভার নিয়েছে অজয় নিজে। অজয়ের দলের পুরোভাগে আছেন বুড়ী ঠাকুরমা। হাতে নিয়েছেন তিনি জাতীয় পতাকা, কণ্ঠে নিয়েছেন মহাত্মাজীর "ভারত ছাড়ো" বাণী। মন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেছেন টুটুনের কথা, সাতপুরুষের ভিটে ভস্মসাৎ হওয়ার কথা, এমন কি অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বীণার পাগল হওয়ার কথা। এগিয়ে আসছেন ঠাকুরমা, চীৎকার করে বলছেন, "ইংরেজ—ভারত ছাড়ো!" আর তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার

জনতার নরনারী পিছন পিছন এগিয়ে আসছে, গলা খুলে চীৎকার করছে, "ইংরেজ—ভারত ছাড়ো!"

মেজর ত্রিবেদী দলবল নিয়ে এগিয়ে এলেন ঠাকুরমার সামনা-সামনি। স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ঠাকুরমা। নিষিদ্ধ এলাকার সাইন-বোর্ড আঙুল দিয়ে ঠাকুরমাকে দেখিয়ে মেজর বললেন, "এ রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হওয়া চলবে না। ঐ যে সাইনবোর্ড দেখছেন, ওর ওদিকে সরকারের অনুমতি ছাড়া এগিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

সাইন-বোর্ডের দিকে একবার তাকালেন ঠাকুরমা, তারপর প্রশান্ত দৃষ্টি মেজরের মুখের উপর ফেলে বললেন, "সরকারের অনুমতির আর আমাদের প্রয়োজন নেই—মহাত্মাজীর নির্দেশ আমরা পেয়েছি বাবা।"

মেজর উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন, "লাইন পেরোলে প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরতে পারবেন না—এইটেই আমি আপনাদের শেষবারের মত জানিয়ে গেলাম।"

শান্ত চোখে চেয়ে অতিশয় শান্ত কণ্ঠে ঠাকুরমা জবাব দিলেন, "এর কোন প্রয়োজন ছিল না বাবা। একথাও আমাদের মহাত্মাজী জানিয়ে দিয়েছেন—হয় করবে, না হয় মরবে।"

নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রশান্ত ভঙ্গী অসহ্য মনে হোলো মেজরের। রাগে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো। কোন কথা না বলে তিনি আবার গেটের দিকে ফিরে এলেন। বাধামুক্ত জনতা দ্বিগুণ উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো, "ইংরেজ—ভারত ছাড়ো!"

এগিয়ে আসছেন ঠাকুরমা। একটু পরেই নিষিদ্ধ এলাকার সাইনবোর্ড তিনি পার হয়ে যাবেন। হেড-কোয়ার্টারের গেটের দিক থেকে শেষবারের মত মেজরের সাবধান বাণী শোনা গেল, "আর এগোবেন না—ফিরে যান, ফিরে যান। এখনো সময় দিচ্ছি—ফিরে যান।"

ঠাকুরমার মুখে ফুটেছে স্বর্গীয় দীপ্তি। কোন বাধাকেই আর বাধা বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। দৃপ্ত ভঙ্গীতে তিনি এগিয়ে চলেছেন, আর চীৎকার করে মেজরের কথার জবাব দিচ্ছেন, "ফিরে যাবার জন্ত আসিনি বাবা। আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। এই নিশান ওখানে না ওড়ানো অবধি আমাদের ফিরবার রাস্তা নেই বাবা—"

গুলির আওয়াজে চকিত হয়ে জনতা দাঁড়িয়ে পড়লো। ঠাকুরমাও দাঁড়ালেন এক মুহূর্ত—গুলি এসে বাঁ-হাতে বিঁধেছে। আঘাতের যন্ত্রণা সামলে নিলেন তিনি—মুখে ফুটে উঠলো প্রশান্ত হাসি। এগিয়ে চললেন ঠাকুরমা, কণ্ঠে সাহসিক বাণী, "এ দিয়ে তোমরা কত রুখবে? এই অসামান্ত অহিংস শক্তির কাছে তোমাদের হাতের ঐ ক্ষুদ্র অস্ত্র বড়ই সামান্ত বাবা—"

আবার গুলি ছোঁড়া হল। জনতার মধ্যে কেউ কেউ ভয় পেয়েছে, বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। এবারের গুলি লেগেছে ঠাকুরমার ডান হাতে। হাত দুটো পঙ্গু করে দিতে পারলেই পতাকা আর হাতে থাকবে না, অথচ প্রাণহানি না করেও জনতার অগ্রগতি বন্ধ করা যাবে—বোধ হয় এমনি কিছু হিসেব করে মেজর ত্রিবেদী গুলি ছোঁড়ার হুকুম দিচ্ছিলেন।

অসহ্য যন্ত্রণায় দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। পতাকা বুকের মধ্যে চেপে ধরে ঠাকুরমা তবু এগিয়ে চলেছেন। ঠোঁটের কোণে মৃত্যুঞ্জয়ী হাসি। গুলির আঘাতে যারা তাঁকে জর্জরিত করছে, ঠাকুরমা তাদের আহ্বান করছেন, "রেখে দাও ওগুলো, রেখে দিয়ে তোমরাও এদিকে এসো বাবা। ভারতমাতার সন্তান আমরা সবাই। তবে তোমরা ওদিকে থাকবে কেন? চলে এসো আমাদের সঙ্গে—আমরা সকলে মিলে স্বাধীন-ভারতের পতাকা উড়াই—"

এবারের গুলি আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, এবার লেগেছে বুকের পাশে। ঠাকুরমা আর এগিয়ে যেতে পারলেন না, দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। ভয়-কাতর

জনতা ঠাকুরমাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এত আঘাত এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও ঠাকুরমা জাতীয়-পতাকার অবমাননা হতে দেন নি—মাটিতে পড়ে গিয়েও দু'হাতে অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে উঁচু করে তুলে রেখেছেন। উড্ডীয়মান ত্রিবর্ণ সেই পতাকার দিকে একবার তাকিয়ে, ঠাকুরমা মুখ ফেরালেন মিছিলের জনতার দিকে। মৃত্যুযন্ত্রণায় মুখ হয়েছে মলিন, কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম—তবু তাঁকে ঘিরে আছে অপার্থিব এক দীপ্তি। মরণ শিয়রে নিয়েও ঠাকুরমা সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন, "আমাকে এরা গুলি করেছে, কিন্তু দেখ—তোমরা সবাই দেখ, পতাকার কিছুই হয়নি। ঠিক তেমনি অমলিন রয়েছে। কে আসবে আমার এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে ?"

ঠাকুরমার মৃত্যুক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান সকলের কানে পৌঁছুলো না—চোখের সামনে মৃত্যুর রূপ দেখে একটী প্রাণীও আর এগিয়ে যেতে সাহস করল না।

নির্বাক ব্যথায় তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অসম্পূর্ণ কাজের ভার কাউকে দিতে পারছেন না, এই যন্ত্রণায় ঠাকুরমা আশাহত চোখে ছটফট করতে লাগলেন।

হঠাৎ দূর থেকে কান্না-মেশানো ডাক শোনা গেল, "দিদিমা, দিদিমা !"

চকিত জনতা মুখ ফিরিয়ে দেখলো, মাঠ ভেঙে নালা ডিঙিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে শিবানী—ছোট্ট শিবানী, ঠাকুরমার সংসারের শেষ বন্ধন। অজয়ের সংসার ছারেখারে গেছে, বাড়ীঘর পুড়েছে। সেই আগুনের প্রথম বলি হয়েছে টুটুন। বীণা হয়ে গেছে পাগল। আর অজয় ? ঠাকুরমার সঙ্গে শেষ বারের মত চোখের দেখা হল না তার। এখনি তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়বে, এ জগতে আর পরস্পরের দেখা হবে না।

মায়ার বন্ধন এক এক করে খসে পড়েছে ঠাকুরমার। সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে গান্ধিজীর নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, "সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হউন—"

কিন্তু এই ছোট মেয়েটার বাঁধন তিনি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ওকে পাশের বাড়ীতে লুকিয়ে রেখে আজ তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। শিবানী যে মুহূর্তে লোকের কাণাঘুষোয় বুঝতে পেয়েছে, ঠাকুরমা দলবল নিয়ে পতাকা হাতে বেরিয়েছেন—অমনি ওর শিশু-মন অমঙ্গলের সম্ভাবনায় কেঁপে উঠেছে। সব বাধা এড়িয়ে সে ছুটে এসেছে তার দিদিমার কাছে। তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিবানী, দু'চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরছে। বলছে, "দিদিমা, দিদিমা, তুমি কেন আমাকে ফেলে চলে এলে?"

শিবানীর মাথা বুকের কাছে টেনে নিলেন ঠাকুরমা। নাঃ, সর্বস্বই তিনি বিসর্জন দেবেন—নিজের বলে আর কিছু তিনি রাখবেন না। বিদ্রোহী মনকে সংহত করে নিয়ে তিনি চুপি চুপি বললেন, "শিবু দিদি, আমার একটা কথা শুনবি?"

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শিবানী উত্তর কোরলো, "তোমার কথা আমি কবে শুনিনি দিদিমা?"

অনেক চেষ্টায় অনেক ব্যথায় ঠাকুরমা বললেন, "পারবি তুই এই পতাকা নিয়ে এগিয়ে যেতে।

চোখ মুছে উঠে বসলো শিবানী। জিজ্ঞাসা করলো, "কোথায় দিদিমা?"

মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে ঠাকুরমা বললেন, "ওই গেটের ভেতরে—"

"হ্যাঁ, তুমি দাও, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি—"

উঠে দাঁড়ালো শিবানী। দু'হাতে পতাকাটা তুলে ধরলো সে।

"আমি এক্ষুণি রেখে আসছি দেখ তুমি···"

সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে মাথার ওপর পতাকা তুলে ধরে শিবানী ছুটলো গেটের দিকে, আর সর্বস্ব-বিসর্জনের তৃপ্তিতে ঠাকুরমা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শিবানী ছুটছে আর চীৎকার করে বলছে, "আমি এক্ষুণি আসছি দিদিমা। তুমি থেকো কিন্তু, তুমি বেঁচে থেকো···"

এক ঝাঁক গুলি এসে লাগলো ছোট মেয়েটার হাতে পায়ে বুকে।

মুখের কথা শেষ হবার আগেই অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো শিবানী। পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরে গড়িয়ে পড়লো রাস্তায়। রাস্তা থেকে পাশে নালার ভিতরে।

"দিদিমা, ওরা আমাকে যেতে দিল না যে!"

অসহ্য যন্ত্রণায় ডুকরে ডুকরে কাঁদছে শিবানী।

হতবাক্ জনতা মৃত্যুর বিভীষিকায় যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা বসে পড়েছে ধুলোর উপরে।

এমনি সময় দূর থেকে শোনা গেল গান—

"ওই কণ্টকময় বন্ধুর পথ বজ্রের সম্ভার
সব যাত্রীর দল বিদ্যুৎবেগে ভেদ করো বুক তার—"

চঞ্চল হয়ে জনতা মুখ ফিরিয়ে দেখলো, বীণার শেখানো গান গেয়ে অজয়ের শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো তারা।

গানের কলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে—

"ওই নারী ও শিশুর আর্তনাদ
অসহ নির্যাতন
দগ্ধ-গৃহের স্তব্ধ প্রাণের
বীভৎস ক্রন্দন
আজ প্রতিজ্ঞ হও বন্ধ করিতে পাশব অত্যাচার।"

মরণাহত শিবানীর কানে গান ভেসে আসছে, ঠাকুরমার স্নেহ-ব্যাকুল আহ্বানের মত। শেষ বারের মত সে হাত দু'টী সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছে, "বড্ড ব্যথা করছে দিদিমা, আমাকে কোলে নাও। আমাকে কোলেই নাও।"

একবার ঠাকুরমার কোলে ওঠার শেষ চেষ্টা করলো সে। তারপর পরম তৃপ্তিতে চোখ দু'টী বন্ধ হয়ে এলো। মৃত্যুর ওপারে বোধ হয় ঠাকুরমার কোলেই সে স্থান পেয়েছে।

* * *

অজয়ের নেতৃত্বে শোভাযাত্রীর নূতন দল এগিয়ে আসছে। আগের দল এগিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ঠাকুরমা ও শিবানীর মৃত্যু-সংবাদ অজয়ের কাছে পৌছল, কিন্তু তার মুখে বেদনার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। টুটুনকে বীণাকে সে বিসর্জন দিয়েছে; ঠাকুরমা আর শিবানীর মৃত্যুও অম্লান মুখে গ্রহণ করল অজয়। দৃপ্ত ভঙ্গীতে জাতীয়-পতাকা উড়িয়ে অজয় গান গেয়ে এগিয়ে আসছে—

"ওই কঙ্কালদল স্থির নিশ্চল চক্ষে সর্পভয়
হিংস্র সে কোন রক্তশোষণ করিছে ওদের ক্ষয়
ওই হত্যা-প্লাবন রুদ্ধ করিতে জাগো আজ দুর্বার।"

নূতন দল এগিয়ে আসতে দেখে মেজর ত্রিবেদী সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বাধা দেবার জন্য আবার গেট থেকে বের হয়ে এলেন। ভারী বুটের মশ-মশ আওয়াজ করতে করতে মেজর সাহেব এগিয়ে এলেন অজয়ের মুখোমুখি। গান বন্ধ হলো, চলমান বিরাট শোভাযাত্রা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। দৃষ্টিতে অগ্নি বর্ষণ করতে করতে মেজর নিষিদ্ধ এলাকার সাইন-বোর্ডটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "From that notice-board it is prohibited area—you know that ?"

অজয়ের চোখে নেই জ্বালা, কণ্ঠে নেই উত্তেজনা। শান্তভাবে সে জবাব দিলো—"জানি—।" এই ঔদ্ধত্যে মেজর বিষম ক্রুদ্ধ হলেন। শক্তি-প্রকাশেই বীরত্ব—ইংরেজ প্রভুদের কাছে এই কথা শিখেছেন মেজর। পশু-শক্তিকে অবহেলা করার যে শক্তি, তা আজ তিনি বারবার প্রত্যক্ষ করছেন। উপরওয়ালা অফিসারদের উপস্থিতিতে এই পরাজয় মেজরের অসহ্য বোধ হল। আরো গম্ভীর হয়ে মেজর ভয় দেখালে,—"Any attempt to cross that board might lead you all to death—you know that ?

অজয়ের মুখে হাসি ফুটে উঠলো—অবহেলার হাসি। মেজরের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জবাব দিলো, "জানি—"

রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন মেজর। ঠাকুরমা আর শিবানীর মৃতদেহের দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে বললেন, Already two have been killed—"

মেজরের আঙুল অনুসরণ করে অজয়ের দৃষ্টি একবার পড়লো ঠাকুরমার ওপর, শিবানীর ওপর। পরমুহূর্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে মেজরের মুখের দিকে তাকালো দৃপ্তভঙ্গীতে। জবাব দিলো, "জানি—"

যে রকম তেজের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন, উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পেয়ে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত অপমানে জ্বলতে জ্বলতে মেজর ফিরে চললেন।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বিনোদ রশীদ ও অন্যান্য বন্ধুদের অজয় বললো "তোরা, আমাকে একটু তুলে ধর্ তো !"

বন্ধুদের কাঁধের উপর ভর দিয়ে শোভাযাত্রীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো অজয়। তারপর জনতাকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে বলতে লাগলো, "বন্ধুগণ, সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ—ঠাকুমা আর ছোট্ট শিবুরাণী আজকের যাত্রাপথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে।"

গলা ভারী হয়ে এল অজয়ের। না, কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার সময় এ নয়। জোর করে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলে, "আমরা যারা পরে এসেছি—আমাদের এগোতে হবে অনেক বেশী। যারা মৃত্যুপণ করে আসতে পারবে তারাই শুধু এসো আমার সঙ্গে।"

জামার পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে অজয় বলতে থাকে, "নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমি আর একবার গান্ধীজীর শেষ নির্দেশ তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই"—চোখের সামনে মেলে ধরে অজয় গম্ভীর স্বরে পড়তে থাকে, "সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া আপনারা অগ্রসর হউন। চরম দমননীতি, বোমাবর্ষণ, গুলিচালনা কোন কিছুতেই বিচলিত হইলে চলিবে না। স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন হইলে মৃত্যুবরণ করিতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। মুক্তির জন্য কোন মূল্যই বেশী নহে। সাহস অবলম্বন করুন—ভগবান আমাদের সহায়। এই সংগ্রামই কংগ্রেসের শেষ সংগ্রাম। হয় সাফল্য না হয় মৃত্যু। করেঙ্গে—

উদ্বেলিত জনসমুদ্র গর্জন করে উঠলো, "ইয়া মরেঙ্গে—"

জনতার পুরোভাগে নেমে দাঁড়ালো অজয়। হাতের জাতীয়-পতাকা মাথার উপরে তুলে ধরলো। জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে আর একবার চীৎকার করলো, "করেঙ্গে—"

জনতা আর একবার গর্জে উঠলো, "ইয়া মরেংগে—"

ছুটে চললো অজয়, পিছু পিছু সব ভয় বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে চললো জনতা। মেজর ত্রিবেদীর সৈন্যদল প্রস্তুত ছিল, নিষিদ্ধ এলাকার সাইনবোর্ড পার হবার সঙ্গে সঙ্গে এলো গুলির শব্দ। এবার আর একটা-দুটো নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে—অসংখ্য।

অনেক ছেলে হত আহত হয়ে লুটিয়ে পড়লো। দু'পায়ে গুলির আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়লো অজয়। গুড়ুম-গুড়ুম অবিরাম গুলির শব্দে সমস্ত স্থানটা রণক্ষেত্রের ভয়াবহ রূপ ধারণ কোরলো। আহতদের চীৎকারে মুখরিত হয়ে উঠলো আলিগ্রাম। উদ্দীপনায় বাধা পেয়ে জনতা আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

* * *

সন্ধ্যা নেমেছে আলিগ্রামের রণক্ষেত্রে······

যুদ্ধজয়ের বিপুল আনন্দে মেজর ত্রিবেদী তাঁর উপরওয়ালা অফিসারদের নিয়ে হেড-কোয়ার্টারের বারান্দায় পান-ভোজনে মত্ত। যে ক'জন ডিউটিতে আছে তারা বাদে অন্যান্য সেপাইরাও হাত-পা ছেড়ে আরাম করছে।

অন্ধকারে হাজার হাজার প্রেত-মূর্তির মত ক্ষুব্ধ ভয়-কাতর জনতা প্রিয়জনের হত-আহত দেহগুলি থেকে অল্প দূরে চুপ করে বসে আছে। এগিয়ে এসে আহতদের মুখে দেবে একফোঁটা জল, কানে শোনাবে সান্ত্বনার বাণী—এটুকু সাহসও তাদের হচ্ছে না। সঙ্গীন উঁচিয়ে দু'জন সেপাই জায়গাটায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মরবার আগে কারো কাছে কোন সাহায্য যেন আহতরা না পায়—মেজর ত্রিবেদী সেই হুকুম জারী করেছেন।

হেড-কোয়ার্টারের গেটের পাশে একটা গাছের তলায় উন্মাদিনী বীণা সারাদিন শুয়ে ছিল। প্রথম শোভাযাত্রা যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন একবার মাথা তুলে দেখে বিরক্তি ভরে মুখ ঘুরিয়ে শুয়েছে। "ইংরেজ, ভারত ছাড়ো—" চীৎকার, ঠাকুরমার মৃত্যু, শিবানীর মৃত্যু কোন কিছুই উন্মাদিনীর মনে দাগ কাটেনি। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘুমিয়ে ছিল বীণা। কিন্তু দূরাগত সমবেত

কণ্ঠের গান তার অবচেতন মনের কোথায় আলোড়ন জাগিয়ে তুললো—

"ওই কঙ্কালদল স্থির নিশ্চল চক্ষে সর্পভয়
হিংস্র সে কোন রক্ত-শোষণ করিছে ওদের ক্ষয়—
ওই কঙ্কালদল..." ওই কঙ্কালদল···

কোথায় শুনেছে এই কথাগুলো—মনের উপর বিস্মৃতির কালো যবনিকা পড়েছে, তারই ফাঁকে কথাগুলো বার বার ফিরে আসে।

"ওই কঙ্কালদল স্থির নিশ্চল চক্ষে সর্পভয়······"

উন্মাদিনী ভাবতে বসে।

গুলির আঘাতে অজয় আহত হল। তারপর বিনোদ, পরেশ আরও কতজন! সন্ধ্যা নেমে আসে। অন্ধকারে আহতদের চীৎকার শোনা যায়। উন্মাদিনী তখনও ভাবছে—"চক্ষে সর্পভয়···" তারপর কি? কোথায় শুনেছে সে একথা? কবে?

গাছতলা ছেড়ে বীণা উঠে পড়ে। বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে এলোমেলো পায়ে সে এগিয়ে আসে। হত-আহতদের মাঝখানে অস্ফুটে বেসুরে গাইতে থাকে।—

"ওই কঙ্কালদল স্থির নিশ্চল চক্ষে সর্পভয়—
চক্ষে সর্পভয়···চক্ষে সর্পভয়···"

মরণাহত পরেশ বীণার গলার স্বর পেয়ে চোখ মেলে তাকায়। তৃষ্ণায় তার বুক শুকিয়ে উঠেছে, বীণাকে দেখে আশা জাগে তার মনে। অনেক চেষ্টায় ফিস্-ফিস্ করে ডাকে, "বৌদি, একটু জল, বৌদি!"

উন্মাদিনীর কানে বোধ হয় পরেশের কণ্ঠস্বর পৌছোয় না। কিম্বা পৌছোলেও মনে দাগ কাটে না। বীণা এগিয়ে যায়—বিনোদের মৃতদেহ পেরিয়ে—অজয়ের আহত দেহের পাশ দিয়ে··

"চক্ষে সর্পভয়—" তারপরে কি? কোথায় শুনেছে? কবে শুনেছে? ঘুরে দাঁড়ায় বীণা। কে যেন কি বললো, না?···কে যেন কি চাইলো, না?···এগিয়ে এলো বীণা।

পরেশ আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। বীণাকে ফিরতে দেখে মনের সব শক্তি একত্র করে সে আবার ডাকলো, "বৌদি, একটু জল—"

বৌদি?—এ ডাক কোথায় সে শুনেছে? ঝুঁকে পড়লো বীণা পরেশের মুখের উপর। কি বলছে লোকটা? সাপের মত দুটো হাত বের করে কই ওকে ধরতে আসছে না তো! ক্ষীণ কণ্ঠে পরেশ আবার বললো, "একটু জল দেবেন বৌদি—"

নাঃ, বাজে লোক। উঠে দাঁড়ালো বীণা। "চক্ষে সর্পভয়—" তারপর কি? কোথায় শুনেছে, কবে শুনেছে? কিন্তু ও লোকটা কি যেন চাইলো···জল? এদিক-ওদিক তাকালো বীণা, তারপর কি ভেবে রাস্তার পাশে ছোট নালার দিকে এগিয়ে গেল।

যে দু'জন সেপাই টহল দিচ্ছিল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ পাগলীর খেয়াল উপভোগ করছিল। আঁচলে ভিজিয়ে জল নিয়ে বীণা উঠে দাঁড়াতেই একজন সঙ্গীন উঁচিয়ে তেড়ে এলো—"এই পাগলী, কেয়া করতা হ্যায়? ভাগ যাও, পানি মৎ দেও, নেহি তো মার দেগা···"

উন্মাদিনী খেয়ালে বাধা পেয়েছে—ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত সে গর্জে উঠলো, "মারবি? মার্, বুকের এদিক দিয়ে ঢুকিয়ে ওদিক দিয়ে বের করে দে—"

রাস্তার ওপর থেকে অপর সেপাই ডাক দিলো, "রে ভাই, ও পাগলী হ্যায়, ছোড় দেও···"

সেপাই দু'জন হাসতে হাসতে হেড-কোয়ার্টারের দিকে ফিরে গেল।

আঁচল-ভেজা জল নিয়ে বীণা এলো পরেশের কাছে, নিঙড়ে নিঙড়ে

শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ঢেলে দিলো তার মুখে। আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো গাছতলার দিকে।

আঘাতের যন্ত্রণায় আর রক্তক্ষরণে অজয় অচেতন হয়ে পড়ে ছিলো, এতক্ষণে একটু একটু করে তার জ্ঞান ফিরেছে। পাশ দিয়ে বীণাকে যেতে দেখে মৃদুস্বরে সে ডাকলো, "বীণা!"

এ কার কণ্ঠস্বর, কে ডাকলো? থমকে দাঁড়ালো বীণা। চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার ঐ ডাক শুনবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো সে। "বীণা, বীণা, বীণা—" বার বার এ কি ডাক? অবচেতন মনের তলা থেকে থিতিয়ে-পড়া স্মৃতির রাশ উপরে উঠে আসতে চায়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় বীণা, এক পা এক পা করে অজয়ের দিকে সে এগিয়ে আসে, দৃষ্টি সজাগ করে ভালভাবে দেখবার চেষ্টা করে অজয়কে। ব্যগ্র মিনতি-ভরা চোখে অজয় বীণার দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে বীণার মনে হয়, ও দু'টি চোখ তার বড় চেনা, বড় আপন। তবু লোকটি যে কে, সে তা বুঝতে পারে না। উন্মাদিনীর দু'চোখ বেয়ে ঝর-ঝর অশ্রু ঝরে পড়ে। অজয়ের পাশে মাটিতে বসে পড়ল বীণা।

মৃদুকণ্ঠে অজয় জিজ্ঞেস করে, "বীণা, বলতে পারো—আমরা কি মিলিটারী-ব্যারাক জয় করতে পেরেছি?"

বীণা কথার জবাব দিতে পারে না, অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবিরাম চোখের জল পড়তে থাকে।

চারিদিকে তাকিয়ে অজয় বুঝতে পারে তাদের পরাজয়ের কথা। সে আবার জিজ্ঞেস করে, "আমাদের আর সব কোথায়?"

এবারেও বীণা কোন জবাব দিতে পারে না, তবে এ কথাটার অর্থ সে বুঝতে পারে। দূরে লোকজন ভিড় করে বসে আছে, সেদিকে

সে শুধু একবার তাকায়। অজয় বোঝে, কি যেন একটু ভাবে, তারপর হাত বাড়িয়ে নিজের পতাকাটা কাছে টেনে নিয়ে বলে, "তুমি একটা কাজ করবে বীণা? ওদের সামনে গিয়ে তুমি দাঁড়াও। মিলিটারী-ব্যারাক জয় আমি করবোই। যদি আমার চীৎকার শুনতে পাও, ওদের এগিয়ে দেবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো। যাও বীণা—লক্ষীটি, যাও।"

পায়ের ওপর ভর দিয়ে অজয় যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারলো না! পতাকা বুকের মধ্যে চেপে ধরে দু'হাতে ভর দিয়ে অজয় হেড-কোয়ার্টারের দিকে বুকে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলো; উন্মাদিনী বীণা তার গমনপথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

*　　*　　*

কে এই লোকটি—যাকে আপন বলে মনে হচ্ছে অথচ চেনা যায় না? কি বলে গেল ও? কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে; কি করতে হবে? উন্মাদিনী বীণার মাথার মধ্যে সমস্ত যেন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। তবু ওর কথা শুনতে হবে, ওর মিনতি-ভরা চোখের চাউনিতে কিসের যেন অনুপ্রেরণা আছে। উঠে দাঁড়ালো বীণা, আস্তে আস্তে মৃতদেহগুলির পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো সে স্তব্ধ জনতার দিকে। হঠাৎ পায়ে কিসের বাধা পেলো। চকিত হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে, কোন এক মৃতদেহের বুকের ওপর একটা পতাকা পড়ে আছে। অন্যমনে পতাকা তুলে নিয়ে পথের একপাশে সরিয়ে ফেলে দিতে গেলো সে, তারপর আবার কি ভেবে দু'হাতে পতাকা বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে এক পা এক পা করে জনতার কাছে এসে দাঁড়ালো। নির্বীর্য নিরুৎসাহ জনতার সামনে রসিদ ও অজয়ের দলের আর ক'টি ছেলে মাথা নীচু করে

বসে ছিল, পতাকা হাতে বীণাকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা উৎসুক হয়ে উঠলো। রসিদ উঠে বীণার পাশে দাঁড়ালো।

ওদিকে পাহারাদার সেপাইদের চোখ এড়িয়ে কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে বুকে ভর দিয়ে অজয় হেড-কোয়ার্টারের সীমানার ভিতর এসে ঢুকেছে। আর একটু—এক মুহূর্ত যদি কারো দৃষ্টিতে সে না পড়ে, তাহলে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে অজয় এগোতে লাগলো। রক্তক্ষয়ে দুর্বল, পিপাসায় কাতর, তবু সে থামবে না। শক্তি দাও, শক্তি দাও ভগবান—শেষ-নিশ্বাস ফেলবার আগে হেড-কোয়ার্টারের এই মাটিতে জাতীয়-পতাকাকে যেন স্থাপন করে যেতে পারে! বড় বাতি ঝুলছিল, বহু কষ্টে অজয় তার নীচে এসে পৌছাল। বহু চেষ্টায় পাশে দাঁড়-করানো একটা মোটর-ট্রাকের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে! তারপর চারিপাশে একবার দেখে নিয়ে দু'হাতে জাতীয়-পতাকা মাথার উপর তুলে জনতার উদ্দেশে চীৎকার করে উঠলো, পেরেছি, পেরেছি, তোমরা দেখ—আমি মিলিটারী ব্যারাক জয় করতে পেরেছি, জাতীয়-পতাকা উড়াতে পেরেছি। এসো—তোমরাও এগিয়ে এসো—

শেষ হোলো না তাঁর কথা। দলে দলে সেপাই ছুটে এলো। মেজরের হুকুম পেয়ে বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে, সঙীনের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করলো তাকে। গান্ধিজীর শেষ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মরণকে জয় করলো অখ্যাত গ্রামের এক অহিংস সৈনিক—

*　　　*　　　*

পতাকা হাতে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বীণা। অজয়ের মর্মভেদী আহ্বান তার কানে এসে পৌছাল, "এসো, এসো—তোমরাও এগিয়ে এসো—"

একমুহূর্তে বিস্মৃতির যবনিকা সরে গেল তার মন থেকে। মনে

পড়লো টুটুনের কথা, ঠাকুরমা শিবানী অজয়ের কথা, হাতের পতাকার দিকে তাকিয়ে মনে পড়লো তার নিজের প্রতিশ্রুতি—"গান গেয়ে আমার দল যাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে।" বীণার কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো গানের কলি—

"সংশয় আর নয়, আর নয়—
মৃত্যুর পথে আনো হে যাত্রী
মৃত্যুর পরাজয়—"

পতাকা দুলিয়ে এগিয়ে চললো বীণা। পিছনে মন্ত্রমুগ্ধের মত জনতা দুর্বার বেগে এগিয়ে আসছে। দু'জন, দশ জন নয় যে কয়েকবার গুলি ছুঁড়ে তাদের গতিরোধ করা যাবে। উন্মাদিনীর নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসছে। নিরস্ত্র তারা—তবু হতবল নয়। হাতে জাতীয় পতাকা, কণ্ঠে গান্ধিজীর বাণী—"ইংরেজ, ভারত ছাড়ো—ইংরেজ, ভারত ছাড়ো!"

এতগুলো লোক ছুটে আসছে দেখে হেড-কোয়ার্টারের বারান্দায় মেজর ত্রিবেদী ও তাঁর উপরওয়ালা ইংরেজ অফিসাররা বিচলিত হয়ে উঠেছেন। গুলিবর্ষণের হুকুম দিতে দিতে মেজর সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন।

ক্যাপ্টেন সিং দৌড়ে এলেন গেটের কাছে—যেখানে সেপাইরা গুলি না ছুঁড়ে জটলা করছে।

তারা বলছে, "গুলী বহুত চালায়া, আউর নেহি চালায়গা। হামভি উ লোককো সাথ হ্যায়, আজাদী হামভি মাংতা হ্যায়।"

"ইংরেজের হুকুম আর আমরা মানবো না।"

"বাপুজী নে কহা হ্যায় আংরেজকো ইয়ে দেশ ছোড়নে পড়েগা।"

বন্দুক একপাশে সরিয়ে রেখেছে তারা। সাধারণ সৈনিকের বুকেও

জেগে উঠেছে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। একটু আগেও গুলি ছুঁড়ে যাদের মেরেছিলো এখন কোল দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে তারা প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন সিং গুলি ছোড়ার হুকুম দিতে এসে ওদেরই দলে মিশে গেলেন।

ইংরেজ প্রভুরা সেপাইদের অস্ত্রত্যাগে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মেজর ত্রিবেদী ততক্ষণে সিঁড়ির নীচে রিভলভার নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বিপদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে অফিসাররা দৌড়ালেন পেছনের গেটের দিকে। অপেক্ষা করলে চলবে না—গেটে গাড়ী প্রস্তুত আছে। যেমন করে হোক এখন তো প্রাণ বাঁচানো যাক, পরে ইংরেজ সেপাই নিয়ে এসে এই বিদ্রোহী জনতাকে সায়েস্তা করা যাবে।

বীণার পিছু-পিছু জনতা তখন গেটের কাছে ঢুকে পড়েছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক কণ্ঠে সেপাইরাও চীৎকার করছে, "মহাত্মা গান্ধী কী জয়, ইংরেজ, ভারত ছাড়ো—"

হেড-কোয়ার্টারের সিঁড়ির নীচে রিভলভার হাতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে মেজর ত্রিবেদী। ইংরেজ-অফিসাররা পালিয়ে যাক, দেশী অন্যান্য অফিসাররা আর সিপাইরা বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিক, তিনি কিছুতেই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবেন না। একলাই দাঁড়িয়েছেন—মৃত্যু পর্যন্ত একলাই ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ভয় দেখানোর জন্য রিভলভারের গুলি ছুড়লেন একবার মেজর, কিন্তু একি! গুলির আওয়াজ শুনলেই যারা পালিয়ে যায়, তারা ভ্রূক্ষেপও কোরলো না। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বনি তুলে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে—মেজরের দিকে। এতক্ষণে মেজর সত্যি সত্যি ভয় পেলেন, এক পা এক

পা করে পিছু হেঁটে তিনি সিঁড়িতে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে জনতাকে শাসাতে লাগলেন, আর রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন একটার পর একটা—

জনতা বাধা মানে না, থামে না। গুলীর আঘাতে দু'একজন আহত হয়ে পড়ে যায়, তবু তাদের চৈতন্য হয় না। স্বাধীন-ভারত কী জয়! মহাত্মা গান্ধী কী জয়!—ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়ে ওঠে। সেই ধ্বনির অন্তরালে মেজর ত্রিবেদীর চীৎকার কোথায় মিলিয়ে যায়। হাজার হাজার নিরস্ত্র সদ্য-জাগ্রত জনগণের সামনে থরথর কাঁপছে যেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ!

জমিদার-বাড়ীর ছাতে যেখানে এতদিন ইউনিয়নজ্যাক সগর্বে উড়তো,সেখানে ত্রিবর্ণ জাতীয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়ে রশীদ চীৎকার করে ওঠে—"বন্দেমাতরম···"

হাজার হাজার কণ্ঠে নীচে থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে—"বন্দে মাতরম্···"

আনন্দে গৌরবে রশীদ হাঁকে—"মহাত্মা গান্ধী কী—"

বিপুল উৎসাহে জনতা চীৎকার করে,—"জয়!"

মণ্ডল মহাজন এতক্ষণ দূর থেকে অস্ত্রের সঙ্গে অহিংসার অসমযুদ্ধ লক্ষ্য করছিলেন। শয়তানি বুদ্ধির চালে দু'দলকেই এতদিন তিনি হাতের মুঠোয় রেখেছেন—যুদ্ধজয়ের লভ্যাংশেও তিনি বঞ্চিত হবেন না। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা গান্ধিটুপী মাথায় পরে ভীড়ের মধ্য দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, উচ্চ-কণ্ঠে জয়ধ্বনি তুলে অগ্নি প্রকাশ করলেন—যেন আজকের এই বিজয়ী দলের নায়ক তিনিই।

একপাশে অজয়ের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ বুকে তুলে নিয়ে কাঁদছে আর হাসছে উন্মাদিনী বীণা। চিনতে পেরেছে সে এতক্ষণে তার স্বামীকে, তার সর্বস্বকে—

বীণার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে! আজ জীবন দিয়ে অজয় আদর্শের জয়-ঘোষণা করে গেল, সেই গৌরবে মুখে হাসিও ফুটেছে তার। বীণা কাঁদছে, আর হাসছে।

*　　　*　　　*

এমনিভাবে কত স্ত্রী স্বামী বিসর্জন দিয়েছেন, কত মা সন্তান আহুতি দিয়েছেন, কত পরিবার—যাঁরা ইচ্ছে করলে ঠিক আমাদেরই মত স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতেন—সর্বস্ব হারিয়েছেন শুধু এক মহা সঙ্কল্প নিয়ে, ভবিষ্যৎ ভারতবাসী কুকুর-বেড়ালের মত নয়—যেন মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারে!

স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে আজ আমরা মুক্ত। নবলব্ধ স্বাধীনতার বিজয়-গৌরবে আমরা যেন বিস্মৃত না হই, উনিশ শো বেয়াল্লিশের মুক্তি-সৈনিকদের আত্মত্যাগের কথা—যুগ যুগ ধরে আরও যে সকল স্বাধীনতাকামী আত্ম-বিসর্জনের পথে স্বাধীনতার সোপান একটী একটী করে প্রস্তুত করে গেছেন তাঁদের সকলের আদর্শনিষ্ঠার কথা।

স্বাধীন ভারতের জয় হোক!